চাচীমা

সম্পাদক

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ১৯৫৫

Published by Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area, Delhi-110032.

সূচী

চাচীমা

কি! এত বড় কথা? শোন রহিম, এ মগের মুল্লুক নয়। আমাদের পাঁচজনের চোখের সামনে এত বড় অন্যায় আমরা হতে দেব না, কিছুতেই না। যদি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, তবে তুমি যাবে—তুমি। হাসিনা যাবে না—কিছুতেই না।

চাচীমা রুখে দাঁড়ান রহিমের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে এগিয়ে এল নইমা, রানী, হিরণ মাসীমা, নূরজাহানরা। ওরাও বলতে থাকল : না, কক্ষনো না, এ আমরা হতে দেব না। ওঠ্ হাসিনা, চৌকির উপর উঠে বোস্। এ ঘর তোর, দেখি কে তাড়ায় তোকে এ ঘর থেকে।

হাসিনার কোলের বছর দু'য়েকের মেয়েটা ভয়ে কাঠ হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে লেপটে আছে। হাসিনা চৌকির পায়ায় মাথা ঠেকিয়ে মেঝের উপর বসে অঝোরে কাঁদছে। রহিম তার পাশে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে। একটু আগেই সে হাসিনাকে গলা ধাক্কা দিয়েছে ঘর থেকে বের করে দেবার জন্য।

বাইরে দাওয়ায় খুঁটি ঘেঁসে নীরবে বসে আছে—কালো বোরখা ঢাকা এক নারীমূর্তি। তার রোগা রোগা হাত-পাগুলো দেখা যাচ্ছে। কিশোরী কি তরুণী বোঝা যায় না। নেহাতই করুণার পাত্র, ঘরে ঢুকবার অনুমতি পায়নি এখনো। প্রতীক্ষায় আছে। কাল রাত থেকে এখানেই বসে আছে। পেটে দানা পড়েনি। তেষ্টার পানিটুকুও পায়নি, চাইতেও সাহস করেনি কারো কাছে।

ওদের আসবার খবর হাসিনা আগেই পেয়েছিল। চাচীমাকে সব জানিয়েছিল। তারপর চাচীমার পরামর্শ মতই রাতে দরজা বন্ধ করে মেয়ে নিয়ে শুয়েছিল। রহিমের ডাকাডাকিতেও দরজা খোলেনি। রহিম রাত্রে আর বেশি ঝঞ্ঝাট না করে দাওয়াতেই শুয়েছিল একটা মাদুর টেনে নিয়ে। বোরখার আড়ালের নারী-মূর্তিটি দাওয়ায় খুঁটি ঘেঁসেই বসে আছে। সকালে দরজা খুলতেই রহিম তেড়ে এসেছিল হাসিনাকে বের করে দিয়ে বোরখা পরা মমতাজকে ঘরে আনবে বলে। কিন্তু তখনই চাচীমা তার দলবল নিয়ে ঢুকে পড়েছে। চাচীমার দাপটের কাছে রহিম নিরস্ত্র সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে।

দেখতে দেখতে রহিমের চালা ঘরের সামনের উঠোনে একটি দুটি করে মানুষ জড়ো হতে থাকল। এল প্রতিবেশী আকবর, তাঁর মা, গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরেশ ভৌমিক, করিম, সদানন্দ, গোলক, স্কুলের দিদিমণি অলকা মণ্ডল, কৃষ্ণা চৌধুরী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও গোলমাল শুনে একে একে এসে জুটেছে। উঠোন ভর্তি ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চাগুলোও ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে। সকালের কচি রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের দাওয়ায়, উঠোনে।

ঘরের মধ্যে নইমা, রানী ওরা হাসিনাকে ধরে উঠিয়ে বসিয়ে দিল চৌকির উপর। চাচীমা বাইরে এসে বোরখা পরিহিতার পাশে দাঁড়িয়ে রহিমের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল: কে? কে এ মেয়ে? আবার কার সর্বনাশ করেছিস রহিম? কোথা থেকে এনেছিস একে?

রহিম রেগে বলল: হ্যাঁ, এনেছি। আমি এই মমতাজকে নিকে করে এনেছি। পাশের গাঁয়ের মেয়ে, ঘরে রাখব ওকে আমি। আর এই হাসিনাকে আপনাদের পাঁচজনের সামনেই বলছি—তালাক—তালাক......।

এ কি? এ কি? সে কি কথা? তা হবে না, হতে পারে না। কেমন করে হবে? অনেকগুলি নারী ও পুরুষ কণ্ঠের প্রতিবাদ গুঞ্জন শোনা গেল।

রহিম বলল: আমার ঘরের কথায় আপনাদের কাজ কি? আমার জাত আছে, ধম্মো আছে।

রহিম কথা শেষ করতে পারল না। চাচীমা চিৎকার করে উঠল: না, আমাদের এ গাঁয়ে এসব চলবে না। তোমার বৌ আছে, মেয়ে আছে। তোমার বৌ কোন দোষ করেনি। তুমি আর একটা মেয়েকে নিকে করে নিয়ে এসেছ। এই মেয়েটারও সব্বনাশ করেছ। তা তোমার নিকে করা বৌয়ের হাত ধরে তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। হাসিনা যাবে না। তার ঘরে সে থাকবে। তার বাপের দেওয়া জমি সে ভোগ করবে। আমরা গাঁয়ের পাঁচজন তাকে দেখবো। তুমি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। তা আমরা হতে দেব না। এই তো, সবাই এসেছেন, বলুন আপনারা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হোক, ঘরের বৌ কোথায় যাবে? যেতে হয় নিজেই যাও বাপু —বলে উঠলেন পঞ্চায়েত প্রধান।

অনেক বাক্-বিতণ্ডা বচসা চলল। কিন্তু জনরোষের সামনে রহিমের হার মানতেই হলো। রহিম রেগেমেগে নিজের জিনিসপত্র কিছু পোঁটলা বেঁধে নিয়ে চলে গেল তার নতুন নিকে করা বৌ বোরখাঢাকা মমতাজকে নিয়ে। কোথায়

যাচ্ছে, কি করবে তা কেউ জিজ্ঞেস করেনি তাকে। তবে সবাই জানে যে জোয়ান পুরুষ মানুষ, যেখানে যাক খেটে খাবে, তার ভাবনা কি ?

তারপরও কয়েকবার এসে উৎপাত করেও রহিম ঘরে ঢুকতে পারেনি। তাড়াতে পারেনি হাসিনাকে তার ঘর থেকে। প্রথম কিছুদিন চাচীমা নিজেই হাসিনার ঘরে ছিল তার অভিভাবক হয়ে। পরে হাসিনার নানা-নানী এসে থাকল তার কাছে। আর শোনা গেল যে রহিম তার নতুন শ্বশুরবাড়ির ভিটের একপাশে একখানা ঘর তুলে সেখানে ছিল। পরের জমিতে কাজ করত। এরা কেউ আর খবর রাখেনি। আর হাসিনার মাথার উপর সব ঝড়-ঝাপটা ঠেকিয়ে বটবৃক্ষের মতো আড়াল করে রাখল চাচীমা।

এই নতুন নজির যে সৃষ্টি করল তার নাম চাচীমা বা হামিদা বেগম। এক ডাকে গাঁয়ের সবাই চেনে। সবাই তাকে চাচীমা বলেই ডাকে। চাচীমা একটি নাম। শ্রদ্ধার, ভালবাসার, ভরসার। চাচীমা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। মহিলা সমিতির গ্রাম কমিটির প্রেসিডেন্ট। হিন্দু-মুসলমান সবাই মানে। মসজিদের মৌলবী-মৌলানারাও তার কথা ফেলতে পারে না। কেমন করে পারবে ? তাদের কত লোকের ঘরে ঘরে বিপদে আপদে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চাচীমা। ঘরের মেয়েদের মধ্যে চাচীমার অবাধ আসা-যাওয়া। তাছাড়া চাচীমা যে আলতাব আলির বিবি। গাঁয়ে ঢুকবার পথেই তো রয়েছে আলতাবের নাম খোদাই করা শহীদবেদী। আলতাবের কথা কি কেউ ভুলতে পারে ? সেই আলতাবের বিবি হামিদা বেগম। আলতাব মারা যাবার পরই সে ঘর থেকে বাইরে এসে পাঁচজনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। হাতে তুলে নিয়েছে আলতাবের হাতের ঝাণ্ডা। সেদিনের উনিশ বছরের যুবতী হামিদা শোকে তাপে পুড়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আজ প্রৌঢ় বয়সের কোঠায় এসে সকলের শ্রদ্ধেয় আপনজন, গাঁয়ের চাচীমা হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে।

বাড়ির উঠোনের পাশেই আলতাব আলির কবর। কবরের গা ঘেঁসে রোদ গড়িয়ে পড়ছে। চাচীমা তার পাশে বসে হাত নেড়ে নেড়ে ধান শুকোতে দিচ্ছে। কয়েকটা মুরগীর ছানা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। গতকালও তাদের সঙ্গে চাচীমার মেয়ে রোশনীর ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। আজ তারা চলে গেছে। রোশনী মাস কয়েক আগেই এসেছিল এখানে দুই ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে, আবার ছেলে হতে। কোলের ছেলে দু'মাসের করে নিয়ে, তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে

কালই চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। জামাই এসে নিয়ে গেছে। আজ তাই বাড়িটা একেবারেই খালি। চাচীমার মন ভাল নেই। ধান নাড়তে নাড়তে স্বামী আলতাবের কবরের গায়ে হাত লাগতেই কবর যেন কথা কয়ে উঠল। এই চাচীমা তখন ছিল ঘরের বৌ হামিদা বিবি। সেই বিভীষিকার রাতটা চোখের সামনে ভেসে উঠল তার।

গাঁয়ের পাঁচজন মিলে যখন আলতাবের দেহটা ধরাধরি করে এনে উঠোনে শুইয়ে দিল, হামিদা তখনো বুঝতে পারেনি যে তার কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে বসে সে তখন মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। প্রথমে তো অত-লোকের সামনে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ভয় পাচ্ছিল। পাড়ার লোকজন জমে গেল। পাড়ার আর কৃষকসভার ছেলেরা কাঁদতে লাগল আলতাবের জন্যে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, ধানের লড়াই, জমির লড়াই করে জান দিয়েছে আলতাব। জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। আলতাবের মৃত্যু নেই, আলতাব শহীদ। আলতাবের নামে শহীদবেদী তৈরি করা হবে, আরো কত কথা বলছিল তারা। কিন্তু হামিদা কি তখন সে সব কথা কিছু শুনেছে, না কে সেখানে ছিল তা দেখেছে? পাগলের মতো ছুটে এসে আলতাবের দেহের উপরই আছড়ে পড়েছিল বুকফাটা কান্নায়। সে এক ভয়ঙ্কর রাতের স্মৃতি।

হামিদা জানত আলতাব কত লেখাপড়া জানে। সিনিয়র মাদ্রাসা পাশ করেছে। তার ঘরে কৃষক সভার ছাপা কাগজপত্র কত আসত। হামিদা সব গুছিয়ে রাখত। আলতাবের কাছে কত লোক আসত, ওরা মিটিং করত, অনেক ভাল ভাল কথা ওদের বলতে শুনত হামিদা। সব কথা বুঝত না, আর পাঁচজনের স্বামীর মতো আলতাব কখনো বৌকে ধরে মারত না, গাল দিত না। ভালবাসত বৌকে। যত্ন করে ঘরে রাখত। আলতাবের উপর বিশ্বাস ছিল হামিদার। কত কথাই মনে পড়ছে আজ হামিদার। সেবার খুব লড়াই গোলমালের সময় আলতাবের দুজন বন্ধু ওদের ঘরে এসে গা ঢাকা দিয়েছিল। পাশের চালা ঘরটায় থাকতো। তাদের আলতাব মনসুর আর করিম বলে ডাকত। তারা লুঙ্গি পরে থাকত বেশিরভাগ সময়ই। আর ছোট ছোট দাড়িও রেখেছিল। প্রথমে হামিদা তাদের মুসলমানই ভেবেছিল। কিন্তু পরে আলতাবের কাছে জানতে পারে যে তারা আসলে হিন্দু। তারা কোন্ গাঁয়ের লোক আর তাদের আসল নাম কি হামিদা তা আজও জানে না। ওরা কমরেড, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। ওরা হামিদার ভাই বলে পরিচয় দিয়েই ছিল এখানে। হামিদা তাদের রান্নাবান্না করে খাওয়াত।

নিজের ভাইয়ের মতই দেখত। তাদের কাছ থেকে কত ভাল ভাল কথা শুনেছে হামিদা। দেশের জন্য যারা এত করছে, মানুষকে এত ভালবাসে, তাদের কিনা পুলিস ধরে অত্যাচার করে? হামিদার মনে কত প্রশ্ন জেগেছে তখন। এখন সে সব কথাই বুঝতে পারে। কিন্তু সেই ভাই দু'জন যে কোথায় গেছে হামিদা তা আর জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয় তাদের আসল নাম জানলে তো খোঁজ করতে পারত।

আলতাব বলেছিল তারা অনেক দূরের গাঁয়ের লোক। কে জানে কোন গাঁয়ের? কোথায় বা আছে তারা?

আলতাব যে তাকে এমন করে হঠাৎ ছেড়ে চলে যাবে, হামিদা তা কখনো ভাবতেও পারেনি। তবে আলতাব তাকে তো পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে। তাই শত দুঃখেও ভেঙে পড়েনি হামিদা বিবি। সেদিন থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তাই তো সে-ই পারছে কত লোককে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করতে।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। হামিদা বলেছিল, না, আমি কারও ঘরে যাব না, আমি নিজের ঘরেই থাকব। নিজের জমির চাষ নিজে করব। আমিও তার মতো ক্ষেতে কাজ করব। যে কাজ করতে করতে সে প্রাণ দিয়েছে, আমিও সেই কাজ করব। তেরো বছর বয়সে বৌ হয়ে এ সংসারে এসেছিল হামিদা। আর বিশ বছরে না পড়তেই তার এমন দশা হলো! এক বছরের শিশু রোশনীকে বুকে জড়িয়ে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল হামিদা। আলতাবের মান সে রাখবে। সে আর কারো ঘরে যাবে না। আর কাউকে নিকে করতে পারবে না সে। যেটুকু জমি আছে তার, চাষ করে চলে যাবে দু-টো পেট, ঠিক চলে যাবে।

কিন্তু সমাজ? সমাজ আছে না? সমাজ যে তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। এই ভরা যৌবনে হামিদা বিবিকে কি কেউ একলা ঘরে টিকতে দেবে? কত কথা উঠল। কত অপবাদ দিতে লাগল আত্মীয়স্বজন। সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন মেজভাসুর। স্ত্রী তাঁর নিঃসন্তান। তিনি এসে বললেন: মেয়েমানুষ কখনো এভাবে থাকতে পারে? আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। তুমি আমার ঘরে চলে এস মেয়েটাকে নিয়ে, আমি তোমাকে নিকে করে নিয়ে যাব। আমার বৌ-কে তো তুমি জানই। তার তো ছেলেমেয়ে নেই। তোমার মেয়েটিকে যত্ন করবে, দুই বোনে মিলেমিশে থাকবে। আমাদের সমাজে এ তো হামেশাই চলে। আমরা আত্মীয়-স্বজন, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে তো? ঐ সব সভা সমিতির

লোকদের সঙ্গে মিশে তোমার কাজ নেই। মেয়ে মানুষ, ঘর সংসার নিয়ে থাক। তোমার জমি-জমার জন্যেও কোনো চিন্তা নেই। সে সব আমি দেখব।

শিউরে উঠেছিল হামিদা। মেজ ভাসুরের সেই লোলুপ চোখ দুটো তখনো তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরে তখন ছিল তার দূর সম্পর্কের এক মাসী। মাসীও সায় দিয়ে বলেছিল: এ তো ঠিক কথাই, এ তো তোর ভালর জন্যেই রে হামিদা। যা না, তাই যা—এনার ঘরেই যা তুই। মেয়েটারও একটা পথ হবে। হামিদা এক ঝটকায় বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। না, না, সে কোথাও যাবে না। সে নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকবে। নিকে সে কাউকে করতে পারবে না। কিছুতেই না—আলতাবের জায়গায় সে আর কাউকেই বসাতে পারবে না।

কিন্তু গোঁ ধরলেই তো হলো না? একদিন তার বাড়ির দাওয়াতেই সমাজের পাঁচজনের সভা বসল। হামিদাকে সাজা দিতে হবে। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। সেখানে আত্মীয়স্বজনও এল। মৌলবী-মৌলানারাও এলেন। আবার এদিকে কৃষক সভার, মহিলা সমিতির লোকেরাও এসে জড়ো হলো। তারা তো সবাই আলতাবের কমরেড। আলতাবের স্ত্রীও তো তাদেরই একজন।

হামিদা এখন কি ভাবে থাকবে? তাদের সমাজ কি বলে, এটাই বিবেচ্য। হামিদা বোরখা পরে নাই। এমনিই মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে মেয়ে কোলে বসেছে একধারে। অনেকেই অনেক কথা তুলল। কিন্তু পঞ্চায়েতের আর মহিলা সমিতির লোকেরা যে ভিতরে ভিতরে কতখানি করেছে তা হামিদা আগে ভাবতেও পারেনি, এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! পঞ্চায়েতের ভৌমিকবাবুর পাশে বসা আবু তাহের মৌলবীই বললেন: উনি যদি নিজের জমি নিজে চাষ করেন তবে আমাদের সমাজের কি ক্ষতি? তবে হ্যাঁ, এই বয়সে একলা বাড়িতে থাকার কিছু বিপদ আছে বটে! তার জন্যে আমাদের একটু দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিতে হবে। এনার ঘরে কোনো আত্মীয়স্বজন যদি আসতে পারেন ভাল, না হলে এই দিদিরা ঠিক করে দিন কেউ একজন থাকুক ওনার সঙ্গে। কত রকম লোক তো আছে চারিদিকে। আর হামিদা মা, আপনি আমাদের সবার নেতা আলতাব আলির বিবি, আপনার কোনো নিন্দের ভয় নেই। আপনার পরদার দরকার নেই। ওই দশ হাত কাপড়ই আপনার পর্দা। আপনি যাতে মানসম্মান বজায় রেখে সমাজে বাস করতে পারেন তা আমরা দেখব। কি বল ভৌমিক ভাই?

ভৌমিক: তা তো বটেই। এই দিদিরাও তো আছেন, সবাই ওনাকে জানেন, মান্য করেন।

অনেকে ঘাড় নাড়লেন, মুখে সায় দিলেন। মহিলা সমিতির বর্ষিয়সী কিরণদি হামিদার পিঠে হাত রেখে তার গা ঘেঁসে বসলেন। হামিদার চোখ দিয়ে এখন জলের ধারা নেমেছে। ওদিকে যারা হামিদাকে শায়েস্তা করার কথা ভেবেছিল তাদের মুখ চুন হয়ে গেল। একে একে সবাই উঠে যেতে থাকল।

সেই তরুণী অসহায় হামিদা কত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আজ প্রৌঢ়া মহিলানেত্রী চাচীমা। পাঁচজনে তার কথা শোনে। নিজের সমাজের লোকেরাও ভয়-ভক্তি করে। হামিদার মেয়ের বয়সই আজ তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে। তিন ছেলে-মেয়ের মা। মেয়ে আজ শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে। মন ভাল নেই চাচীমার। আজ সে একাই আছে। আলতাবের কবরের পাশেই উঠোনে ধানগুলো বিছিয়ে দিচ্ছিল সে। কত কথাই আজ মনে পড়ছে তার।

হাঁক দিল নইমা আর রানী : ও চাচীমা, আমরা সবাই যে আপনার জন্যে বসে আছি। স্কোয়াডে যাবেন না, বেলা হয়ে গেল যে ?

এই চল্, যাচ্ছি, ধানকটা নেড়ে দিয়ে যাই। আজ তো দক্ষিণ পাড়ায় যেতে হবে, ফিরতে দেরি হবে অনেক।

: আমাদের গাঁয়ের কত মেয়ে হবে বলুন তো কলকাতার সমাবেশে যাবার জন্য ?

: অত ভাবিস না। আমাদের তো ২০ জন নিয়ে যেতে বলেছে জেলা কমিটি। তা আমরা ফেলে ছেড়ে ৩০-৩৫ জন নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পারব। কাল আবার আমাদের নুর-এর বৌ আর লক্ষ্মী বাউড়ী এসে ধরেছিল, আমরাও যাব কলকাতায়। আর ঐ রহিমের বউ হাসিনাকেও নিয়ে চল। ও বেচারা কেঁদেকেটে দিন কাটাচ্ছে। ওকে একটু সঙ্গে সঙ্গে না রাখলে কিন্তু বিগড়ে দেবার লোক অনেক আছে ওর পিছনে। ঐ যে নানা আর নানী এসে রয়েছে ওর কাছে, ওদেরও বিশ্বাস নেই। আবার কবে রহিমটাকে ঘরে ঢুকিয়ে না দেয়।

নইমা : না না, হাসিনা ঠিক আছে, বেশ তেজী মেয়ে। তোমার হাতে ঠিক থাকবে।

চাচীমা : আর দ্যাখ, সবাই তো গাড়িভাড়া দিতে পারবে না। কিছু কিছু চাঁদা আমাদের তুলতে হবে।

রানী : বারদফা দাবির কাগজগুলো কোথায় চাচীমা ? আপিসে তো পেলাম না।

চাচীমা : কাল তো তোরাই আমার হাতে দিলি, বললি ঘরে রেখে দিও। ঐ

তো ঘরে রেখে দিয়েছি গুছিয়ে, নে' চল সঙ্গে করে। আর কাগজগুলো দেবার সময় তোরা তো একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলবি মানুষকে ? আমাদের মেয়েদের কি কি দাবি, কি আমাদের অবস্থা—এসব কথা কাগজে লেখা থাকলেই তো আর হলো না ? ভাল করে বুঝিয়ে বলবি তো নিজেদের কথাগুলো, তোরা বড় মুখচোরা।

রানী : তা তুমিই বা ভাল করে মুখ খোল না কেন ?

চাচীমা : আমি কি তোদের মতো লেখাপড়া জানিরে ?

রানী : ঐ হয়েছে, আবার তোমার সেই কথা, জানি না—বুঝি না। মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পার, আর তুমি কিছু জান না, না ? চল চল চাচীমা, দেরি হয়ে গেল।

চাচীমা : চল্ যাই—

আরো বছর দুই পেরিয়ে গেল, আবার চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে, বিশেষ করে মেয়েমহলে। কি ব্যাপার ? না কেন্দ্রীয় সরকার নাকি এমন একটা আইন করতে চলেছে যাতে তালাক দেওয়া মুসলিম মেয়েরা আর আগের স্বামীর কাছে খোরপোস দাবিও করতে পারবে না। ছেলেমেয়ে নিয়েও তাদের পথে বসতে হবে। কি সর্বনাশ ! একেই তো কথায় কথায় তালাক আছে, তারপর আবার খোরপোসও চাওয়া যাবে না ? আর হিন্দু মেয়েদের বা অন্য ধর্মের মেয়েদের যে অধিকারটা আছে, সেটা মুসলিম মেয়েরাই বা পাবে না কেন ? আবার সেই আইনটার নাম নাকি 'তালাকপ্রাপ্ত'র মুসলিম নারীর অধিকার রক্ষা'র আইন ? আদপে অধিকার রক্ষার নামে অধিকার হরণ করে নেবার আইন জারি করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ! বিক্ষোভ ফেটে পড়ল চারিদিকে। মিটিং মিছিল, দরখাস্ত, সই সংগ্রহ চলতে থাকল।

চাচীমাদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, ঘরে ঘরে প্রচার করতে হচ্ছে। মেয়েদের সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে মুসলিম মহিলা বিলের বিরুদ্ধে স্মারকলিপিতে সই সংগ্রহ করতে হচ্ছে। না, এটা কিছুতেই হতে দেবে না ওরা। মেয়েদের সমান অধিকার নিয়ে এতদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে ওরা, এখন কিনা যেটুকু অধিকার আছে তাও কেড়ে নিতে যাচ্ছে কেন্দ্রের সরকার। দেশটাকে কি আবার পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে নাকি ? আবার কি ওরা সেই সতীদাহ প্রথাও চালু করবে নাকি ? আবার কি হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে দেবে ? তাই এই বিপদ ঠেকাতে সবাই মিলে নেমে পড়েছে।

গ্রাম শহরে মেয়ে পুরুষ সবার মুখে মুখেই শোনা যাচ্ছে—আবার নাকি দিল্লির সরকার মেয়েদের বিরুদ্ধে একটা কালাকানুন আনছে।

চাচীমারা জীবনে স্বপ্নেও এমন ভাবেনি। কলকাতা পর্যন্ত তারা মিটিং করতে গেছে সেবার। এবার নাকি সারা দেশ থেকেই হিন্দু-মুসলিম মহিলারা দল বেঁধে যাচ্ছে দিল্লি সরকারের কাছে মুসলিম মহিলা বিলের প্রতিবাদ জানাতে। ওদের জেলা থেকেই যাবে বিশজন মহিলা। তার মধ্যে চাচীমাদের সঙ্গে হাসিনাও যাবে। আনন্দে ও গর্বে বুক ভরে ওঠে চাচীমার। বারবার মনে পড়ে তার আলতাবের কথা। আলতাব জানতে পারল না তার হামিদা বিবি তার নাম রেখেছে। তারই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ফিরে ফিরে তাকায় সে আলতাবের কবরের দিকে, চোখ ভরে জল আসে তার।

আর মাত্র দু'দিন আছে দিল্লি রওনা হবার। দূরের পথ। গোছগাছ করতে হবে। উঠোনে কাঠের আগুনে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে কাপড়জামা সোডা দিয়ে সিদ্ধ করতে বসেছে চাচীমা। হাসিনা এসে দাঁড়াল। কোলে তার বছরখানেক বয়সের একটা ছেলে। সঙ্গে হাসিনার পাঁচ বছরের মেয়ের হাত ধরে মাথায় কাপড় দেওয়া একটি যুবতী মেয়ে।

চাচীমা বলল : কিরে হাসি, আবার ছেলে পেলি কোথায় তুই। এটি কে? দেখিনি তো কোনোদিন?

হাসিনা : আর বল কেন চাচীমা? এ ছেলে আমার এই সতীন মমতাজের। একে তো আমিও আগে দেখিনি কোনো দিন। কেমন করে দেখব? প্রথম দিন তো বোরখা ঢাকাই ছিল।

মমতাজ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল চাচীমার মুখের দিকে। চাচীমা বলল : বা! দিব্যি সুন্দর মুখখানা তো তোমার। তা ব্যাপার কি? রহিমটা আবার এসে জুটেছে বুঝি তোর ঘাড়ে এদের সব নিয়ে? ঢুকতে দিয়েছিস ঘরে?

হাসিনা : না চাচীমা সে মিঞা আসে নাই। সে নাকি কোথায় যায়, কি করে, দিনের পর দিন ঘরে আসে না। বৌ-ছেলেকে দেখে না। এ মেয়েটা কেঁদেকেটে উপোস দিয়ে দিন কাটায়। বাপের বাড়িও যেতে দেয় না। তারপর সেদিন রাত্তিরে তাড়ি গিলে এসে মাতলামি শুরু করল। মেয়েটা কান্নাকাটি করছিল। কোলের ছেলেটা চেঁচাচ্ছিল। সে নাকি একে ধরে বেদম মার দিয়েছে। এই দেখ, হাতে কপালে পিঠে এখনো দাগ রয়েছে, ফুলে উঠেছে।

: তারপর?

: তারপর আবার কি? এর চেঁচামেচি শুনে যখন পাড়ার লোক আসছিল তখন সে মরদ একে তালাক তালাক তিন তালাক বলে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে কোথায় চলে গেছে। তিন দিন হলো, আর ফেরে নাই।

চাচীমা : তা এখানে কেমন করে এল?

উত্তর দিল মমতাজ : আমি নিজেই এখানে চলে আসলাম। বাপের বাড়ি গিয়ে ভাইকে বললাম, আমারে সতীনের বাড়ি রেখে আয়। সে মনে হয় লোক ভাল, আমারে একটা আশ্রয় দেবে।

চাচীমা : তা তুই ঠিকই তো বুঝেছিস। একটা দুঃখী মানুষ আর একটা দুঃখী মানুষকে ফেলে দিতে পারে?

হাসিনা : জান চাচী, এরে আমি কত বোঝালাম আমরা কেন দিল্লি যাচ্ছি সে কথা। তা বলে কিনা, আমারেও নিয়ে চল। তাই বললাম, তবে চল, চাচীমারে বলি।

চাচীমা : সে কি রে, তুই মেয়ে দিল্লি যাবি কি করে?

মমতাজ : আমি গাড়ি ভাড়া যোগাড় করব। বাপজানের কাছ থেকে চেয়ে আনব।

হাসিনা : আরো কি বলে জান?

চাচীমা : কি বলে?

হাসিনা : বলে যে দিল্লির রাজাদের কাছে বলবে যে আমাদের মেয়েদেরও যেন তালাক দেওয়ার অধিকারটা দেওয়া হয়।

চাচীমা : তাই নাকি? তা ঠিক কথাই তো বলেছে।

মমতাজ : আমারে নিয়ে যাবা তো?

চাচীমা আর হাসিনা দু'জনেই হেসে ওঠে। চাচীমা হাসিনার কোল থেকে মমতাজের ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে : আচ্ছা চল তো সমিতির আপিসে, দেখি কি করা যায়।*

---

* এই গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার সজল রায় চৌধুরী। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করেছে গণনাট্য সংঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখা। চাচীমার নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিশিষ্ট শিল্পী রেবা রায় চৌধুরী]

জ্বালা

এইখানে, দিদিমণি, আমার বুকের মাঝখানটায় একবার হাত দিয়ে দেখ কি জ্বালা এখানে। তোমরা কি বুঝবে? আমাকে দেখে কি কেউ বুঝতে পারে কি আগুন চাপা আছে আমার বুকের মাঝে? কে বা দেখছে, কে বা জানছে? আমি তো একজন অতি সামান্য মানুষ। গাঁয়ের মেয়ে। গাঁয়ের একজন সরকারী দাই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলে-মেয়ে প্রসব করাই। হাতে করে সেবাযত্ন করি মায়েদের, বাচ্চাদের। সে কাজ করে আমি আনন্দই পাই। আহা, বড় কষ্টের সময়ই ওরা ডাকে আমাকে। আমাকে দেখলে পোয়াতি মায়েদের মুখে হাসি ফোটে। প্রাণে বল আসে। সেই তো আমার সুখ। আর কচি ছেলে যখন আমারই হাতের উপর কেঁদে ওঠে! তখন আমার কত আনন্দ হয়। এ সময় কিন্তু আর জাতপাতের বিচার থাকে না। হিন্দু মুসলমান বামুন শুদ্দুর সবাই আমাকে ডেকে পাঠায়। প্রাণের দায়েই ডেকে পাঠায়। কত রকম মানুষের ঘরে ঘরে যাতায়াত করি। কত লোকের সুখ-দুঃখের ভাগী হই। আমার জীবনে দুঃখ কিসের?

পয়সা কড়ি? সরকারী দাই হিসেবে মাসে মাসে ৫০ টাকা করে পাই। তাছাড়া যে সব বাড়িতে দাইয়ের কাজ করি, সেখানকার গিন্নী মায়েরাও আমাকে আদর যত্ন করে। সবাই ভালবাসে। চেনা পরিচয় হয়ে গেছে বহু লোকের সংগে। সময় অসময়ে সবাই সাহায্য করে। চলে যায় এক রকম। আমার ছেলেমেয়ে? ঐ একটাই ছেলে আছে এখন আমার। আর একটা তো চলে গেছে দুই বচ্ছর বয়সে। ছেলেটার আমার টি বি হয়েছে। যাদবপুর টি বি হাসপাতালে আছে। আমাদের গাঁয়ের পঞ্চায়েত থেকেই লেখালেখি করে হাসপাতালে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমিও তো গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন মেম্বর। গাঁয়ে পাঁচজনের মধ্যে কাজ করি। বলতে নেই, ভালবাসে সবাই। যদি যান কোনোদিন আমাদের গাঁয়ের দিকে—ঐ নদীয়া জেলার ভায়না গেরাম। জিজ্ঞেস করবেন, শায়রাবানুকে চেন? এক ডাকে সবাই চিনবে আমাকে। হ্যাঁ, ঐ আমার নাম। হাসছেন কেন? হিন্দু ভেবেছিলেন আমাকে? না, আমি হলাম মুসলমান। হ্যাঁ, আমি তো মুসলমান ঘরেরই বৌ। ওহো, আমার এই থান কাপড়ের বেশ থেকে বুঝি আমাকে হিন্দু ঘরের বিধবা ভেবেছিলেন? না, আমি হিন্দুও না, আর ঠিক বলতে গেলে

বিধবাও না। মরণ আর কি? বিধবার পোশাক তো হিন্দু আর মুসলমানের একই। আর পোশাক কেন, তাদের বরাতও এক, দুঃখ-কষ্টও এক। যে সব মেয়েরা জীবনভোর দগ্ধে দগ্ধে মরে তাদের আর হিন্দু-মুসলমান কি? ওদিকে সব সমাজই এক। সবাই মেয়েমানুষকে পায়ের তলে পিষে মারতে চায়। তা আর কতদিন পারবে? চিরদিন কি মানুষের একইভাবে চলে? আমাদেরও দিন আসবে।

কি বললেন? আমার বয়েস? তা দু'কুড়ি ছাড়িয়ে তিন কুড়ির দিকে হলো বৈ কি? স্বামী?...ঐ কথাই তো বলছি। স্বামী নেই, আবার আছেও বলা যায়। না, না, স্বামী মারা যায়নি। আছে, এখনো বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। ঘর সংসার করছে। ঘরে তার আর এক বিবি আছে। তিন নম্বর বিবি। আর দুই নম্বর বিবি গত হয়েছে। তার চার চারটে ছেলেমেয়ে আছে ঘরে। আর আমি হলাম গিয়ে এক নম্বর বিবি। বে হয়েছিল সেই ছোট বেলায়। বার বছর বয়েসে। এখনো বেঁচে আছে সেই 'ধার্মিক' মৌলবী স্বামী, কিন্তু তার কথা আমি মুখে আনতে পারি না। যেখানে যাই সবাই জিজ্ঞেস করে স্বামী কোথায়, কি করে? তাই অনেক জ্বালায় এই বিধবার বেশ পরে থাকি। এই খালি হাত, এই থান কাপড় পরা, এ আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। বোরখা? না, বোরখা টোরখা পরি না, ওসব ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন।

কি বলব? স্বামী তো আমাকে তালাক দেয় নাই, তাড়িয়ে দিয়েছে। আর আমি তো মেয়েমানুষ, আমার তো স্বামীকে তালাক দেবার আইন নাই, তা সে যত দোষই করুক না কেন। তাই স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার যতটুকু আমার নিজের হাতে আছে, তাই করেছি। বিধবার বেশ পরেছি। নিজের মনে মনে আমি মুক্ত হয়ে গেছি। কিন্তু মনে মনে মুক্ত হলেই তো হবে না, মাথার উপর যে সব সময়ই খাঁড়া ঝুলছে। সে মৌলবী তো আমাকে এখনো তালাক দেয়নি। অধিকারটা বাধিয়ে রেখেছে। আইন তার পক্ষে আছে। যে কোনো দিন ইচ্ছে করলেই আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে ঘরে। আবার যখন ইচ্ছে তালাক দিয়ে দিতে পারে। তাহলে বলুন তো আমার অবস্থাটা কি? এ কি সহ্য করা যায়? অনেক দুঃখেই আমি আমাদের সমাজের মৌলবী-মোল্লাদের শাসন ছিঁড়ে ফেলে তোমাদের মহিলা সমিতির সঙ্গে চলে এসেছি। এখন তোমরা পাঁচজন আছ। গাঁয়ের পঞ্চায়েত আছে, আর আমার ভয় নেই।

এখন আমি ভালই আছি। সরকার থেকে ঐ পাঁচ কাঠা খাস জমি দিয়েছে। সেখানেই একটু কুঁড়ে ঘর বেঁধে আছি। সরকারী দাইয়ের কাজ করি। পঞ্চায়েতের

কাজ করি। আমি এখন স্বাধীন। এই তো তোমাদের কতজনের সঙ্গে এক গাড়িতে দিল্লি যাচ্ছি। এতে আমার কত আনন্দ তা জান? রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি—মুসলমান মেয়েদের আইনের অধিকার দাবি করতে যাচ্ছি। এতখানি যে আসতে প্যরবো তা কি কখনো ভাবতে পেরেছি স্বপ্নেও? মুসলমান মেয়েদের আবার আইনের অধিকার! মুরগী পোষার মতো পোষা, ইচ্ছে করলে কেটে খাও, নয়তো বেচে দাও, কি তাড়িয়ে দাও, এই তো! কি আছে বই পত্তরে জানি না। আমাদের মতো দুঃখী কি কেউ আছে নাকি? ঘরে ঘরে দেখ ঘুরে ঘুরে। বুকের মধ্যে মেয়েদের কত জ্বালা। মুখ বুজে কত সহ্য করছে তারা। আর মেয়েদের বেলায় হিন্দু বা কি, আর মুসলমানই বা কি? সব ঘরে ঘরেই তাদের এক অবস্থা।

এই তো আমার সতীনের কথাই ধর না। প্রথমে এসেই আমার বড় ছেলেটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললো। তারপর তার নিজেরই বা কি হাল হলো? মৌলবীর অত্যাচারে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দিন কাটাতো। একটা একটা করে চার চারটে সন্তানের জন্ম দিয়ে পাঁচটার সময় যমের দুয়োরে ঢুকে গেল। কি তার সুখ হলো? আমার ছেলেটাকে মেরেই বা সে কি শান্তি পেল? বোঝে না, মেয়েরা তাদের নিজেদের অবস্থাই বোঝে না। তাই তো বলি দিদিমণি, তোমরা কোমর বেঁধে লাগ, ভাল করে ওদের সব বোঝাও।

আমার ছেলেমেয়ে? এখন আমার ঐ একটি ছেলেই আছে। ঐ যে বললাম টি বি হাসপাতালে? বসির, ওর নাম বসির। ডাক্তার বলেছে কয়েক মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। দেখা যাক। এই তো কালই গিয়েছিলাম হাসপাতালে দেখতে। ছেলেটার মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না। খাওয়াতে পরাতে পারি নাই, তাই এই রোগে ধরেছে। পাঁচজনের আশীর্বাদে তবু চিকিৎসাটা করা হচ্ছে, এই যা মনের বুঝ দেই।

না না, দুঃখ কিসের আমার? ঘরে ঘরে কত দুঃখী মেয়ে রয়েছে আমাদের গাঁয়ে, এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে। হ্যাঁ, আমারো তো বিয়ে হয়েছিল আর পাঁচটা মেয়ের মতন, ছোটবেলায়, ১২ বছর বয়সে। বছর তিন চার হেসে খেলে ভালই কেটে ছিল। বাপ আমার ছিলেন অবস্থাপন্ন চাষী। আমার বিয়েতে জমি দিয়েছিলেন পাঁচ বিঘে। দেনমোহর ধরা ছিল ৫২৫ টাকা। স্বামী হলো মাদ্রাসা ইস্কুলের মাস্টার, গাঁয়ের মৌলবী। ঐ মৌলবীর কাজ করার সময়ই সব ছেলে মেয়েরা আসতো নমাজ পড়া শিখতে। নমাজ পড়া শেখাতে শেখাতে মৌলবীর ভাব হয়ে গেল তার পাড়ার এক মেয়ে রাবিয়ার সঙ্গে। তারপর তো রাবিয়ার পেটে ছেলে

এসে গেল। আমারও তখন পেটে এই ছেলে বসির তিন মাসের। মৌলবী তো রাবিয়াকে ঘরে নিয়ে এল নিকে করে। কি আর করি তখন? মুখ বুজে সবই সহ্য করলাম। কিন্তু টিকতে পারলাম না স্বামী আর সতীনের জ্বালায়। আমার প্রথম ছেলে রহিমকে সতীন দুধের সংগে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললো। স্বামী মারধর শুরু করলো আমাকে। আমার এই ছেলে বসির যখন নয় মাসের পেটে, তখন একদিন লাথি মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে। আমি বারান্দার এককোণে বসে কাঁদতে লাগলাম। পাশের বাড়িতেই থাকতেন আমার ভাসুররা। ভাসুর এসে ডেকে নিয়ে গেলেন আমাকে। কি মতলব ছিল তা তখন বুঝি নাই। ভাসুরের বাড়িই থাকতে লাগলাম। বলতে নেই, ভাসুর জা আমার খাওয়া পরার কষ্ট দেয় নাই। তবে সংসারের কাজকর্ম করতাম, দাসীর মতই থাকতাম। শেষে ছেলেটা হলো। ওদিকে আমার সতীনের ঘরেও একটা মেয়ে হলো। স্বামী আর ভাসুরের মধ্যে কি কথাবার্তা হলো। স্বামী এসে আবার আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। দুই সতীনের পাশাপাশি দুই ঘর। মৌলবী স্বামী তার ইচ্ছেমতো কোনোদিন এ ঘরে কোনোদিন ও ঘরে থাকত। পুরুষদের বেলায় যা ইচ্ছে তাই চলে। যত কড়াকড়ি সব মেয়েদের বেলাতেই। আর তখন তো আমার এমন চোখও খোলে নাই। তাহলে আর অত অপমান মুখ বুজে সহ্য করতাম না। এখন তো কারও স্বামী অত্যাচার করলে পাড়ার মেয়েদের ডাকে আমিই ছুটে যাই তাদের কাছে। সেই মাটির মেয়ে আমি যে আজ এমন করে তোমাদের সংগে চলে আসতে পারবো তা কি কখনো ভেবেছি? আজ আমার ছেলেটার অসুখ। তাছাড়া আর কোনো দুঃখ নেই আমার। কোনো নালিশ নেই আমার তোমাদের কাছে।

তবু বুকের মধ্যে আমার জ্বলে যায়। সে জ্বালা তোমরা বুঝবে না। কিসের জ্বালা? না না, স্বামীর জন্যে নয়। স্বামী আমি চাই না। অমন মানুষকে কে চায়? 'ধার্মিক' মৌলবী! ঘরে এসে তার এত অধর্ম্মো! তবুও চোখ কান বুজে স্বামীর ঘরেই ছিলাম মাস কয়েক। কুটবুদ্ধি মৌলবীর ব্যবহারটাও দিন কতক বেশ নরম নরম ছিল। তখন তো বুঝি নাই আসল মতলব কি। স্বামী আর ভাসুর মিলে আমাকে দিয়ে টিপছাপ দিয়ে আমার বাপের দেওয়া জমিগুলো সব নিয়ে নিল। তারপরই আমাকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিল। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলাম। বাবা তখন নেই। ভাইয়ের সংসারে গিয়ে উঠলাম। ছোট ভাই। বড় ভাই চলে গেছে বাংলাদেশে। ছোট ভাইয়ের অভাবের সংসার। আমি তখন পরের বাড়ি খেটে খাওয়া শুরু করলাম। এই আমার শুরু হলো ঘরের বাইরে পা বাড়ানো। তা ভালই হলো। তাই তো যোগা-

যোগ হলো তোমাদের সমিতির সঙ্গে। আর ঐ যে আমাদের এম এল এ দাদা রবি বিশ্বাস? ওনার তুলনা নেই। নিজের ভাইয়ের মতো আমাকে সাহায্য করেছেন। সরকারী খাস জমি পাইয়ে দিয়েছেন। কুঁড়েঘর বেঁধে দেবার টাকা যোগাড় করে দিয়েছেন পঞ্চায়েত থেকে। আর সমিতির মেয়েরা বলে কয়ে এই সরকারী দাইয়ের কাজটা করে দিয়েছে। তিন মাস ট্রেনিং দিয়েছে বিনে পয়সায়। এখন আমার অভাব কিসের? আমি আজ তোমাদের পাঁচজনের একজন হয়ে দিল্লি যাচ্ছি সরকারের কাছে দরবার করতে। আর দুঃখ কিসের আমার তোমরাই বল?

কিন্তু এই দেখ, বুকের মধ্যিখানে হাত দিয়ে দেখ, বুকটা আমার জ্বলে যাচ্ছে। কেন? অন্যায়ের কোনো বিহিত হয় নাই তাই, কোনো শোধ নিতে পারি নাই। আমাকে দিয়ে মিথ্যে করে আমার সম্পত্তি লিখে নিল টিপছাপ দিয়ে। সেই সম্পত্তি ভোগ করছে শয়তান মৌলবী। আর সেই যে আমার প্রথম সতীন রাবিয়া? যে আমার ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল? সে তো চারটে ছেলেমেয়ে রেখে আবার বাচ্চা হবার সময় ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে গেল। মৌলবী আবার একটা নিকে করে এনেছে শুনেছি, দেখি নাই। লোকটার কি আক্কেল তাই বল?

আর আমার অবস্থাটা বোঝ। আমি আইন কানুনে এখনো সেই মৌলবীর বৌ হয়েই আছি। আমাকে সে ঘরে ঠাঁই দেয় নাই। তালাকও দেয় নাই। দেন মোহরের ৫২৫ টাকা পাওনা ছিল তাও দেয় নাই। আর আমি তো মেয়েমানুষ। আমার তো তালাক দেবার অধিকার নাই। সে অধিকারটা আমাদের চাই। এই যে আমার সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তবু কিন্তু আমাকে একেবারে ছাড়ে নাই। যখন ইচ্ছে জোর করে নিয়ে যেতে পারে, আবার তালাকও দিতে পারে। এ জিনিস কি সহ্য করা যায়? তোমরাই বল দিদিমণিরা? তাই তো আমার বুকের মধ্যে এত জ্বালা। সবার সামনে আমি থান কাপড় পরে বিধবা সেজে থাকি। কিন্তু তাতে কি আর এ জ্বালা ধুয়ে মুছে যায়? এর একটা বিহিত কর দেখি তোমরা? আইন করে আমার অধিকারটা দাও দেখি ঐ মৌলবীকে তালাক দিয়ে দেবার, আর আমার বাপের দেওয়া সম্পত্তিটা ফিরিয়ে আনবার।

এই জ্বালা নিয়েই আমি মনের আনন্দে যাচ্ছি দিল্লির সরকারের কাছে দরবার করতে। আমাদের মেয়েদের আইনের অধিকার সমান সমান থাকা চাই। তা সে

বিয়ের কথাই বল, তালাকের কথাই বল, আর সম্পত্তির কথাই বল। এই জন্যেই তো বুকটা আমার জ্বলে যায়। এ রকম ঘরে ঘরে অনেক বুকই জ্বলে। তোমরা কি তা টের পাও? কে বা তাদের খোঁজ রাখে? এই কথাটাই আমি বলতে চাই।

নীল কোট

বেশ বিরক্ত হয়েই সরে বসি। ধাক্কাটা মানুষের নয়। বিদেশী সৌখীন ওভারকোটের। টুকরো টুকরো সাদা মেঘের মতো সাদা সাদা ফার বসানো গলার কলারে হাতায়। গাঢ় নীল রঙের লেডিস ওভার কোটটার দিকে চেয়ে থাকি। এতক্ষণে ওভারকোটের অধিকারিণী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন : সরি, মে আই সীট ?

: নিশ্চয়ই—প্লীজ—।

প্লেন ছাড়ছে। নিচের সবুজে ঢাকা মাটির পৃথিবী ধীরে ধীরে বিচিত্র রূপ ধারণ করছে। তারপর মিলিয়ে গেল, মিশে গেল খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের মতো, কত রং, কত রূপে চিরবিস্ময়ে ভরা পৃথিবী।

: একস্‌কিউস মি প্লীজ !

সুবেশা স্মার্ট এয়ারহোস্টেস ব্রেক ফাস্টের প্লেট নামিয়ে দিয়ে গেল। আরে। এতক্ষণ তো খেয়াল করিনি যে পাশে বসে আছেন দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মহিলা যাত্রীটি মোটেই মেমসাহেব নন, একজন বাঙালিনী। সুন্দর মুখখানা এত বিষাদভরা কেন ? যেন নাড়া দিলেই চোখের জল ঝরে পড়বে। কি নিদারুণ আঘাতে যেন ভেঙে পড়ছে। গম্ভীরভাবে এয়ারহোস্টেসকে বললেন : আমি খাব না, নিয়ে যান।

এবার আমি সুযোগ পেলাম। বললাম : ও, আপনি বুঝি বাঙালী ? বাংলা কথা বললেন ? আমি ভেবেছিলাম—

: মেম সাহেব ? তা মেমসাহেব বই কি ? আমরা হলাম সাজানো মেম সাহেব। ভিতরে ভিতরে ভারতীয়। হাড়ে হাড়ে বাঙালী। আর সেটাই শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারছি না।

ভদ্রমহিলার কথার মধ্যে বেশ ক্ষোভ আছে। আত্মভর্ৎসনা করছেন ? কেন ? স্বভাবতই কৌতূহল জাগে। বিশেষত এমনি সময়, যখন পাশাপাশি বসেই আছি, আর উঠবারও উপায় নেই। তখন বসে বসে পাশের যাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাতে বেশ ভালই লাগে।

: আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে ? কিছু খেলেন না যে ?

: না না, অসুখ করেনি, আমার মা আমাকে পেট ভরে পিঠে পায়েস খাইয়ে দিয়েছেন সাত সকালে। মায়ের নিজের হাতে তৈরি—

আশ্চর্য! এই প্রবাসী মাঝবয়সী বাঙালী ভদ্রমহিলা বেশ সরস আলাপী।

: আপনার মা কলকাতায় থাকেন? দিল্লি যাচ্ছেন বুঝি?

: মা এই দমদমের কাছেই আমার বোনের কাছে থাকেন। মাকে দেখতে দেশে এসেছিলাম পাঁচ বছর পর। আমরা থাকি কানাডায়। দিল্লি হয়ে কালই কানাডায় রওনা হব। আপনারা তো বেশ আছেন, নিজেদের দেশেই থাকতে পারেন। আর আমাদের মতো যারা দুর্ভাগারা পড়ে আছে বিদেশে—এই তো এসেছিলাম কতদিন পরে। আর হয়তো আসাই হবে না। মাকে আর কোনদিনই দেখতে পাব না—।

ধীরে ধীরে বেশ হৃদ্য আলাপ জমে ওঠে। ভদ্রমহিলা নিজের কথা বলে চললেন। যেন মনের বোঝা কিছু ঝেড়ে ফেলতে পারলে একটু হালকা হতে পারেন।

: একলাই এসেছি। কে আর আসবে সংগে বলুন অত দূর দেশ থেকে? আমার স্বামী তো ওখানকার মানুষই হয়ে গেছেন। সেই প্রায় পঁচিশ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে উচ্চ ডিগ্রির জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন। তারপরই ওর বরাত ফিরে গেল। একটার পর একটা ভাল ভাল কাজ পেতে পেতে এখন কানাডা গিয়েই ঘর বাড়ি করে বসে গেছেন। এদেশের মতো তো নয়। ও সব দেশে কাজের সুযোগ সুবিধা কত। ওখানেই ওর মন বসে গেল। ওদেশের সিটিজেনশিপ নিয়ে পাকাপাকিভাবে থেকে গেলেন। হায়রে, আমাদের নিজেদের দেশে যদি তেমন সুযোগ-সুবিধা থাকত, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির যোগ্য মর্যাদা থাকত, তাহলে কি আর এমনি করে ভাল ভাল ছেলেরা সব বিদেশে গিয়ে পড়ে থাকত? কি করবে? দোটানায় থাকতে থাকতে শেষে বিদেশেই পড়ে থাকে। আস্তে আস্তে দেশের উপর টানটাও ক্রমশ কমে আসে। ভাবলে দুঃখ হয় না? ছেলে মেয়েরাও বড় হচ্ছে ওদেশের মানুষের মতই। ওদের শিক্ষাদীক্ষা চালচলন হাবভাব সবই আলাদা। জানেন, আমার ছেলেমেয়েদের একটা ডায়ালগ টেপ করে এনেছিলাম আমার মাকে শোনাব বলে। ভাবলাম মা কত খুশি হবেন নাতি-নাতনীদের কথা শুনে। কিন্তু কি হলো জানেন? ওদের কথার টেপ শুনে মা কেঁদে ফেললেন। বললেন, ওমা, আমার নাতি-নাতনীরা বাংলা কথা বলতে পারে না? একি ভাষা—আমি তো কিছুই বুঝি না! সত্যিই ওরা পারে না বাংলা কথা বলতে।

এক আমি যা বলি। আমার সঙ্গে কখনো বা ভাঙা ভাঙা দু'একটা বাংলা কথা বলে। ওদের বাবা তো কখনই বাংলা বলেন না, মাতৃভাষাটাও যেন ভুলে গেল। কি দুর্ভাগ্য বলুন তো? ভদ্রমহিলার গলায় আক্ষেপ ফুটে উঠল। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি। তিনি বলে চললেন: দেখবেন? দেখুন এই যে, আমার ছেলে মেয়েদের ছবি। হাত ব্যাগ থেকে চমৎকার দুখানা রঙিন ছবি বের করে দেখালেন। সদ্য সমুদ্রস্নান থেকে উঠে ভিজে সাঁতারের পোশাকে বালির উপর এলোমেলো হয়ে বসে আছে একদল ছেলেমেয়ে।

: এই যে দেখুন এরা দুটি আমার ছোট ছেলে আর মেয়ে। স্কুলে পড়ে। আর এই যে দেখছেন—খোঁচা খোঁচা মুখ ভরা দাড়ি পাশের মেয়েটির সঙ্গে হা হা করে হাসছে, এ আমার বড় ছেলে। কলেজের পড়া শেষ করে এ্যাপ্রেনটিসের কাজ করছে একটা কারখানায়। এই মেয়েটি ওর গার্ল ফ্রেণ্ড। ওর সঙ্গেই বিয়ে হবে আসছে বছর। ওদের বাড়ি ছিল যুগোস্লাভিয়ায়। এখন ওরা অমেরিকাবাসী হয়ে গেছে। আমার ছেলের সঙ্গে এক সঙ্গেই পড়েছে কলেজে। ও দেশের যেমন ধারা। ছাত্রজীবন থেকেই গার্ল ফ্রেণ্ড, বয় ফ্রেণ্ড হতে থাকে। হয় বিয়ে করল, নয় করল না। তাতেও নিন্দে নেই। আমরা কিন্তু অতটা ছেড়ে দিতে পারি না। বলেছি, পরের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবে, ভাব করবে, তাহলে বাপু তাকে বিয়ে করে সংসার কর। মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট কর না। দেখছেন তো ছবিতে ছেলেমেয়েরা কত খুশি। ওরা তো দেশ-বাড়ি আত্মীয় স্বজন জানে না। জন্ম থেকে ঐ দেশেই মানুষ। দেশের কথা বললে কারও আসার আগ্রহও জাগে না। দেশের মর্মই বোঝে না। আর আমার স্বামী তো রাতদিন কাজের মধ্যেই ডুবে থাকেন। বলেন, দেশে গিয়ে আর কি করব? এখানে এত রোজগার, এত সুবিধে। ছেলেমেয়ে যে ভাবে মানুষ হচ্ছে, দেশে গিয়ে তো তা আর সম্ভব নয়? এখানেই মানিয়ে থেকে যাই। মন খারাপ করে আর কি হবে? তবু আমার মনটা কাঁদে—দেশের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, মা-র জন্য। তাই একাই ছুটে এসেছি। ফিরে যেতে মন চাইছে না।

আমি তো জানি আমাদের এই কলকাতার জীবনের স্বাদই আলাদা। প্রাণ যেন উচছে পড়ছে। কত মানুষ—কত যেন সব আপনজন...।

ভদ্রমহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি: তা ওটাই যদি আপনাদের নিজেদের দেশ হয়ে যায় তাহলেই বা ক্ষতি কি? সকলেই তো ওখানে লেখাপড়া কাজকর্ম করছেন। ওদেরই সঙ্গে মিলেমিশে আছেন।

কি বলছেন? তাই কি হয়? আমার স্বামী একটা কাজের মধ্যে ডুবে

আছেন, ভাল আছেন। প্রচুর উপার্জন করছেন, যা এদেশে কখনই সম্ভব হতো না। তাই এখানে আর ফিরে আসাও সম্ভব হবে না। তেমনি ভাবেই মন তৈরি করে ফেলেছেন। এখানেও ওর মা-বাবা তো নেই। মামা-মামী আছেন। তাদের কাছেই মানুষ হয়েছেন। আগে ওরাও গরিব ছিলেন। এখন তো অনেক টাকা পয়সা আমার স্বামীই পাঠান। আমার মাকেও পাঠান। আমার মামাতো দেওরকেও উনি নিয়ে গেছেন কানাডায়। একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমাদের থেকে অনেকটা দূরে থাকে। সে আবার আরো এককাঠি। এদেশে এসে থাকতেই পারে না, এমন সব নবাবী অভ্যেস হয়ে গেছে। গত বছর এসেছিল দুমাসের ছুটি নিয়ে, তা ছুটি ফুরোবার আগেই ফিরে গেছে। এখানকার ঘর বাড়িতে নাকি থাকাই যায় না। এখানকার বাথরুম-পায়খানা ব্যবহার করতে পারে না। করত কি জানেন? রোজ সকালে উঠে দমদম এয়ার পোর্টে ভি. আই. পি লাউঞ্জে গিয়ে বাথরুম পায়খানা সেরে আসত। কি করবে? কমোড্ ছাড়া সে পারে না। আর মামাদের পুরনো ভাড়া বাড়িতে তো ওসব নেই। সবেতেই তো অসুবিধে। আমার ছেলে-মেয়েরাও তো তেমনি হয়েছে। ওখানে তো পায়খানা বাথরুমেও জল, ঝাঁটা এসব নেই। ঝকঝকে কারপেট পাতা। ওরা ও সবেই অভ্যস্ত। আস্তে আস্তে আমারও ও সব সয়ে যাচ্ছে।

: তাহলে আপনারা তো বেশ আরামেই থাকেন।

: তা বলতে পারেন বটে, ঐ এক রকমের আরাম।

যাদের ভাল লাগে তাদের লাগে। আমার ওসবে মন বসে না। আমি তো আর চাকরি বাকরিও করি না। আর ওদের সোসাইটিতে মিশি বটে, তবে ঠিক মেশে না বুঝলেন—।

অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। কি জিজ্ঞেস করা যায় আর এই মহিলাকে, যিনি নিজেই যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছেন? তবুও বলি: ও দেশেই বুঝি বিয়ে হয়েছিল আপনাদের?

: না না, তা কি করে হবে? আমি তো আর এমন কিছু বিদুষী মহিলা নই, বড় লোকও নই, যে নিজেই বিদেশে পড়তে বা চাকরি করতে যাব? আমি তো গরিব ঘরের মেয়ে। ছোট বেলায় বাবা মারা যান। দু'টি বোন আমরা। মা কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই গান বাজনার ঝোঁক ছিল আমার। তাতেই পথ খুলে গেল। স্কুল থেকে পাশ করে রবীন্দ্র ভারতীতে নাচ গান শেখার সুযোগ হয়ে গেল। পরে অনেক ফাংশানেই নাচতাম।

: বাঃ! আপনি তো বেশ গুণী মেয়ে দেখছি।

: ঐ গুণেই তো ভালও হলো, আবার মন্দও হলো। একবার মহাজাতি সদনে শ্যামা নৃত্যনাট্যে শ্যামার ভূমিকায় ছিলাম আমি। রবীন্দ্র ভারতীর এক টিচারের বন্ধু ছিলেন আমার স্বামী। তিনি তখন দেশে এসেছিলেন ছুটিতে। বন্ধুর সঙ্গে এসেছিলেন আমাদের ফাংশান দেখতে। ব্যাস, তাঁর চোখে পড়ে গেলাম নাচের আসরেই। তারপর দু'মাসের মধ্যে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল। আমার মা, আত্মীয়স্বজন সবাই তো হাতে স্বর্গ পেলেন। আমিও তো এত সৌভাগ্য কল্পনা করতেও পারিনি কোনোদিন। বড় জোর একটা নাচের স্কুলে মাস্টারী পাব ভবিষ্যতে তাই ভেবেছিলাম। আর সেই আমি কিনা কোন্ সুদূর সাগর পারে স্বপ্নপুরীতে পাড়ি দিলাম আকাশে ডানা মেলে। হাতের মুঠোয় আমার স্বর্গ নেমে এল যেন। কত যে রঙিন কল্পনা করেছিলাম। হ্যাঁ, প্রথম ক'বছর খুবই ভাল লেগেছিল। কত যে আনন্দ ফূর্তি ছড়িয়ে আছে ও দেশেব চতুর্দিকে। অনেক ভারতীয় বন্ধুবান্ধবও জুটে গেল। কয়েকটা বাঙালী পরিবারের সঙ্গেও আলাপ হলো। খুব ফ্রি সোসাইটি তো, বেশ ভালই লাগত। অভাবের সংসারে মানুষ হয়ে অত টাকা পয়সা ফূর্তি বিলাসিতা—ভালই লাগত। কিন্তু এখন আমার আর ভাল লাগে না। মনটা মাঝে মাঝে দেশের জন্যে খাঁ খাঁ করে। তবে হ্যাঁ, টাকা পয়সার অভাব আমাদের নেই। তবুও মনে হয় অভাবে অনটনে আমার বোনের সংসারটাই যেন অনেক ভাল।

: কোথায় আছেন আপনার বোন?

: ঐ যে বললাম, আমার মা আছেন বোনের কাছেই, দমদমের কাছেই। বোনের বিয়ে হয়েছে—আসলে ওরা প্রেম করে বিয়ে করেছে। দুজনেই ইউনিভারসিটিতে বি. টি. পড়ত একসঙ্গে! এখন বোন বেলঘরিয়ায় একটা প্রাইমারী স্কুলের টিচার। ভগ্নিপতিও স্কুলে পড়াত। ওর চাকরিটা চলে গিয়েছিল—সেই যে '৭১-৭২ সালে খুব গোলমাল হয়, তখন। রাজনীতি করে তো? তাই ওদের উপর খুব হামলা হয়েছিল। বেচারীর চাকরি গেল, বাড়ি ছাড়া হয়ে পালিয়ে পালিয়ে প্রাণ হাতে করে কতদিন ঘুরেছে। এখন আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। ওরা গুছিয়ে সংসার করছে। তবে ভগ্নিপতি তারপর থেকে আর চাকরি করে না। সারাক্ষণ ইউনিয়ন পার্টি এইসব করে। একটি ছেলে ওদের, স্কুলে পড়ে। সরকারি ফ্রি স্কুল। ভাল বড় ইংরাজি স্কুলে দেবে কি করে? অভাবের সংসার। বলতে গেলে বোনের চাকরীটাই তো সম্বল। আবার কিছু সাহায্য করতে চাইলেও ওদের মর্যাদায় বাধে। একবার বললাম, তোদের ছেলেটাকে দে,

ওদেশে নিয়ে গিয়ে আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভালভাবে মানুষ করি। তা ওরা দুজনে গ্রাহ্যই করল না। বলে, আগে দেশকেই ভাল করে জানুক, তারপর তো বিদেশ। কথাটা ভাবতে গেলে ঠিকই, দেখুন তো আমার ছেলে-মেয়েরা তো নিজের দেশকেই জানল না। ভাবলে খুব খারাপ লাগে। অভাবে অনটনে চলা বোনের সংসারটায় বেশ শান্তি আছে কিন্তু। আসলে জলের মাছ জলে আছে তো? আর মা তো ওদের কাছেই থাকেন। আসবার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কি কান্না—।

: তা আপনিও তো মাঝে মাঝে আসতে পারেন। আবার কবে আসবেন?

: আমার আর আসা হবে কি? ইচ্ছে তো আছে। আসলে কি জানেন? আমাদের দেশটাও বড় দুর্ভাগা। নইলে এত ভাল ভাল মেধাবী ছেলেরা সব দেশ ছেড়ে পালাবেই কেন? এতে কি দেশের কম ক্ষতি হচ্ছে? বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, স্কলার—ওরা সব দেশে থাকলে কত উন্নতি হতো দেশের?

: আপনি এত ভাবেন জেনে বড় ভাল লাগছে। অনেকের তো ধারণা, যারা বিদেশে গিয়ে বসে আছে তারা আর দেশের কথা মোটে ভাবেই না।

: ওটা আপনাদের ভুল ধারণা। নিজের মায়ের সঙ্গে যেমন নাড়ির টান, তেমনি দেশের সঙ্গেও। কিন্তু কি করবে? উপায় কি? ভাল ভাল ছেলে-মেয়ে পাশ করে বসে থাকে, সুযোগ পায় না মনমতো কাজের। ওদিকে এত প্রলোভন। এত ঐশ্বর্যের হাতছানি ওসব দেশের। প্রথম অনেকেই উচ্চ ডিগ্রির জন্য বা সাময়িক কোনো কাজের জন্য যায়, তারপর অতসব সুযোগ সুবিধা পেয়ে চমকে যায়। তারপর ঐ একরকম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, মানিয়ে নিতে হয় সব অবস্থাতেই। ভদ্র মহিলাকে আশ্বস্ত করে বলি: অত ভাবছেন কেন? আমাদের দেশও একদিন কি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাবে না? দেশের অবস্থার কি আর পরিবর্তন হবে না? তখন দেখবেন এদেশ থেকে গিয়ে যাঁরা নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করছেন তাঁরাই অনেকে দেশের উন্নতির জন্য কতখানি করতে পারবেন।

: তা হয়-তো পারবেন। আর দেশের অবস্থাও হয়-তো একদিন বদলে যাবে। কত সুযোগ-সুবিধা পাবে ছেলে-মেয়েরা। কিন্তু সে আর আমাদের জীবনে হয়ে উঠবে না। আমাদের ওখানেই মানিয়ে নিতে হবে। বাঁধা পড়ে গেছি যে নানাভাবে। দেখুন না, এই তো যাচ্ছি—আর কি আমার আসা হবে? জানিনা, ততদিনে হয়তো আমার মা আর থাকবেন না। তাঁর তো বয়েস হয়েছে—মাকে আমার আর

দেখা হবে না। দেশের মাটিতে হয়তো আর পা দেওয়াই হবে না আমার—নিজেকেই যে কী অপরাধী লাগে—।

ভদ্রমহিলার গলার স্বরে বিষাদ ফুটে উঠল। অভিভূত হয়ে যাই তাঁর গভীর আন্তরিকতায়।

হঠাৎ মাইকে ঘোষণা শোনা গেল : একটু পরেই আমরা দিল্লি পৌঁছচ্ছি... সকলে কোমরের বেল্ট বাঁধ...।

দিল্লির মাটিতে ঠেকল আমাদের প্লেন। আমরা দুজনে নমস্কার বিনিময় করে দরজার কাছে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলা আমার সামনেই দাঁড়িয়েছেন। আজ রাত্রের প্লেনেই তিনি রওনা হয়ে যাবেন তাঁর গন্তব্যস্থল কানাডায়। তাঁর লম্বা ওভারকোটটা আর গায়ে দেননি। হাতের নিচে এলোমেলো করে চেপে রেখেছেন। সুন্দর নীল কোটের রংটা যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, সাদা সাদা পালকের ঝালরগুলো অবিন্যস্ত ম্লান হয়ে গেছে।

খাদ

না, অভীক আসেনি, প্লেন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল চন্দনা। আনমনা হয়েই এগিয়ে চলল সামনের দিকে। হঠাৎ হাতে একটা চাপ পড়তেই ফিরে তাকাল চন্দনা। না, অভীক নয়। তার ভাই শমীক। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, এই যে বৌদি, এদিকে, এসে গিয়েছি আমরা। তোমার প্লেন তো এক ঘণ্টা লেট। আমরা সব অপেক্ষা করছি। মাসীমা, রীণা, শম্পারা সব ঐ দিকে। চন্দনা শমীকের মুখের দিকে চোখ তুলে চাইল। ঠিক অভীকের মতই চেহারা। চলন বলন ভাব ভঙ্গিমা একই রকম, তবুও সে অভীক নয়। সে অভীকের ছোট ভাই শমীক।

শমীক চন্দনার হাতে একটা ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে বলল: তোমাকে কি দিয়ে অভিনন্দন জানাব বৌদি, তোমার এত অসামান্য সাফল্য। চন্দনা ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলল: বাঃ চমৎকার! সবাই ভাল আছ তো? এতক্ষণে যেন শমীকের সম্বিত হলো। তাড়াতাড়ি বলল: ওঃ বৌদি, দাদা না, আসতে পারেনি একটা জরুরি কলে বেরিয়ে গেল, আমাকে বলল, তুই যা। চন্দনার চোখ দুটো অভিমানে ঝাপসা হয়ে আসে। ততক্ষণে মায়ের গভীর আলিঙ্গন, বান্ধবীদের উচ্ছ্বাস, হৈ চৈ করে সবাই গাড়িতে উঠে গেল।

গত একমাস ধরে অভীকের কোন চিঠি পায়নি চন্দনা। পর পর তিনখানা চিঠির উত্তর পায়নি। তার আগের মাসেই খুব মামুলি চিঠি পেয়েছে অভীকের, কেমন আছ, ভাল আছি গোছের দায়সারা চিঠি। তার মধ্যে ভাবুক অভীকের সেই শিল্পী মনের ছোঁয়া কোথায়? তার আগের চিঠিগুলোর সাথে এ চিঠির মিল কোথায়? আজ প্রায় সাড়ে তিন বছর পর এত বড় একটা এফ. আর. সি. এস ডিগ্রি নিয়ে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরল চন্দনা, আর অভীকের কি একবার এয়ারপোর্টে আসবারও সময় হলো না? অজানা ভাবনায় মন ভারী হয়ে ওঠে চন্দনার।

ভ্যাপসা গরম। রাত দশটা পর্যন্ত চেম্বারে রুগী দেখেছে প্রখ্যাত ডাক্তার চন্দনা হালদার। ফিরে এসে স্টাডিতে বসেছে। আমেরিকান মেডিক্যাল জার্নালের লেখাটা এ সপ্তাহেই পাঠাতে হবে। সামনের সপ্তাহে বিশেষ সেমিনারে

যোগ দিতে লণ্ডন যাবার আগে অনেকগুলি কাজ সেরে যেতে হবে। সেমিনার পেপারটার উপর আর একবার ভাল করে চোখ বুলোতে থাকে চন্দনা। রাত বারটা বেজে যায়। মা এসে বললেন: কিরে খুকী, আর কত রাত জাগবি। একটু খেয়ে শুয়ে পড়। চমকে উঠল চন্দনা, মা, তুমি এখনো জেগে আছ? তাড়াতাড়ি একটু গরম সুপ আর দুখানা টোস্ট খেয়েই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে চন্দনা।

ঘুম আসে না। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানার উপর। পাশের ঘরে মা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। পা টিপে টিপে উঠে আসে চন্দনা। সামনের বারান্দার দরজা খুলে দিয়ে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় এসে বসে। নিস্তব্ধ রাতের চাঁদ আর সে মুখোমুখি বসে থাকে। কি আছে এই রাত্রির নিঃসীম গভীরে?

সে আজ কত বছর হলো? তিন? চার? না, না পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল অভীকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তার। হ্যাঁ, আইনতই হয়েছিল। নইলে তো অভীক সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে পারত না। সন্ধ্যা এখন অভীকের স্ত্রী—সন্ধ্যা সোম। কেন? কেমন করে? যেদিন ফিরে এসেছিল চন্দনা বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে, সেদিন রাতে অভীকের সেই কথাটা এখনো বারবার কানে বাজে চন্দনার: তুমি এখন আমার চেয়ে অনেক বেশি বড় হয়ে গেছ চন্দা, কত নাম-ডাক তোমার। এখন তো আর কেউ বলবে না যে এই হলো চন্দনা সোম, ডাক্তার অভীক সোমের স্ত্রী। বরঞ্চ আমাকেই আঙুল দিয়ে দেখাবে, ঐ যে ডাক্তার চন্দনা হালদারের স্বামী। হো হো করে হেসে উঠেছিল অভীক। ব্যঙ্গের হাসি। চন্দনা বলেছিল, আর সেই লজ্জায় কি তুমি এয়ারপোর্টে যাওনি আমাকে রিসিভ করতে? থমথমে হয়ে উঠেছিল সেই মিলনের রাত্রি। হ্যাঁ, আজ অভীক সন্ধ্যাকে পেয়েছে, সম্পূর্ণভাবেই পেয়েছে, তার স্ত্রী হিসাবে। সে শুধু অভীকেরই স্ত্রী, তার অর্ধাঙ্গিনী, জীবন সঙ্গিনী, কর্মসঙ্গিনী, তার একান্ত অনুগত সেবাপরায়ণা সহায়ক। এর চেয়ে একজন কৃতী পুরুষের আর কি চাই?

একটার পর একটা ছবি ভেসে ওঠে চন্দনার চোখের সামনে। অভীকের অহংবোধ পদে পদে আঘাত করেছে চন্দনার আত্মসম্মানকে। কি এক সূক্ষ্ম ব্যবধান গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। কলকাতার শ্যামবাজারে অভীকদের তিনপুরুষের বনেদি বাড়িতে তার বাবার চেম্বারেই বসেছে ডাক্তার অভীক সোম। চেম্বারের লাগোয়া নার্সিং হোমে সিনিয়ার নার্স সন্ধ্যা সান্যাল। আগে থেকেই পরিচিত। অভীকের চেম্বারের পাশেই ছিল চন্দনার চেম্বার। তার খ্যাতি ও পশার ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভীকদের বনেদি বাড়ির সাবেকী আবহাওয়ায় অশান্তি শুরু

হয়ে গেল। ওদের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানটা আর চাপা থাকে না। একদিন চন্দনা চলে আসে তার মা বাবার কাছে যাদবপুরের বাড়িতে। গড়িয়াহাটার কাছে নতুন চেম্বার খুলে বসেছে প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দেশী বিদেশী গোটাকয়েক উচ্চ ডিগ্রি পাওয়া ডাঃ চন্দনা হালদার। ব্যস্ত দিন। মাঝে মাঝে যাওয়া আসা। মাঝে মাঝে দেখা শোনা। দিন কেটে যায় কাজের মধ্যে। বিবাহিত জীবনের উষ্ণ স্পর্শ ক্রমশ কাঁটা হয়ে বিঁধতে থাকে। তখনই বুঝতে পেরেছিল চন্দনা, ওদের মাঝখানে এসে পড়েছে এক সহজ সরল নার্স সন্ধ্যা। চন্দনা চোখের জল ফেলেনি। অভিমানে কাঁদেনি। দক্ষ চিকিৎসকের মতই নিজেকে দুজনের যৌথ জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ে বাবার কথা। লণ্ডন থেকে স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে যাবার আগে বলেছিলেন মাকে : না—চন্দনাকে তুমি বাধা দিও না। ওর জীবনের সাধনায় ওকে সফল হতে দাও। ওর যতটুকু যোগ্যতা আছে, বিকশিত হতে দাও। মা কেঁদে ফেলেছিলেন : বিয়ে হয়েছে মেয়ের, স্বামী ছাড়া একলা বিদেশে বড় ডিগ্রি নিতে যাওয়া কি মানায় ? বাবা বলেছিলেন : না মানানোর কি আছে ? ওরা তো দু'জনে দুজনকে জেনেশুনেই বিয়ে করেছে। অভীক তো বাধা দিচ্ছে না, তুমি কেন বাধা দিচ্ছ। মা বলেছিলেন : ভয় করে। কেন তা জানি না। আমাদের দেশের যা নিয়ম তাই তো মানতে হবে ? সব বিষয়েই স্বামীর চেয়ে স্ত্রী একটু ছোট হয়েই থাকে—বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান গম্যি, বয়েসে, মাথায়---সব বিষয়েই মেয়েরা একটু খাটো থাকলে সংসারটা শান্তিতে থাকে। ঐ যে বৈদিক যুগে স্বামীর চেয়ে বেশি পণ্ডিত হয়ে গেছে বলে খনার জিভ নাকি কেটে ফেলতে হয়েছিল। বাবা হো হো করে হেসে উঠেছিলেন : সে যুগ এখন আর নেই।

মনে পড়ে, যেদিন ওদের ডিভোর্সের সংবাদটা এল, বাবা চন্দনার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন : আশীর্বাদ করি মা, তোমার জীবন তুমি নিজের হাতেই সার্থক করে তুলবে। বাবা তো নিজে অনেক সংগ্রাম করেছেন, তাই সব বুঝতেন। স্কুল জীবন থেকেই ঢাকার এক বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। একটি বড় আদর্শের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। একমাত্র মেয়ে চন্দনাকে মনের মতো করে মানুষ করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যা কিছু পেয়েছিলেন, তা দিয়েই চন্দনার জন্যই এই বাড়ি, চেম্বার সবই বানিয়ে দিয়ে গেছেন। আজ বাবা নেই। মা আছেন তার পাশে। মা তো সবই বোঝেন, অনেক পোড় খাওয়া মানুষ যে।

অভীক কি সুখী হয়েছে ? হয়তো হয়েছে, হয়তো হয়নি। কে জানে ?

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে চমক ভাঙল চন্দনার। নিচে উঁকি দিয়ে দেখল, না, এ বাড়িতে নয়। কেউ আসেনি তার কাছে। পাশের বাড়ির গ্যারেজ খোলার শব্দ হলো। কাল সকাল সাতটাতেই একটা সিরিয়াস অপারেশন আছে। আরো কয়েকটি কেস সেরে সামনের সপ্তাহে যেতে হবে লণ্ডনের সেমিনারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাতৃত্বের দায়িত্বের উপর পেপার লিখেছে সে। ঘড়িতে কটা বাজল? রাত ১টা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কর্মব্যস্ত ডাক্তার চন্দনা হালদার।

আশেপাশে কোন বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে ১২টা বাজল। রাত বেড়ে চলেছে। অভীক টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তন্ময় হয়ে পড়ছে 'ইণ্ডিয়ান মেডিকাল জার্নাল'-এ ছাপা ডাক্তার চন্দনা হালদারের বিশেষ প্রবন্ধ, 'মডার্ণ কনসেপশন অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং'। এক নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকাল অভীক। পাশের খাটে অঘোরে ঘুমচ্ছে সন্ধ্যা। সারাদিন নার্সিং হোমের খাটুনির পর ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়েছে। মুখের চেহারায় সহজ সরল প্রশান্তি। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে তার বুক, পেট। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বেড়ে উঠছে সন্ধ্যার গর্ভে তাদের সন্তান। অভীক চমকে উঠল। এই কি চেয়েছিল সে? সংসারের এই বন্ধনে বাঁধা পড়ার জন্যই কি একদিনের তরুণ শিল্পী অভীক সোম স্বপ্ন দেখেছিল? অভীক তো ডাক্তার হতেও চায়নি। চেয়েছিল শিল্পী হতে। ভাল লাগত তার ছবি আঁকতে। বাবাই জোর করে বলেছিলেন, আমাদের তিন পুরুষের ডাক্তারখানা, নার্সিং হোম সব কার হাতে দিয়ে যাব? আমার দুই ছেলেকেই ডাক্তারী পড়াতেই হবে। তাই তো বংশের পেশা রক্ষার জন্য তার ডাক্তারী পড়া। চন্দনার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তে একদিন ক্লাসে বসেই ছবি এঁকেছিল চন্দনার। চন্দনা অবাক হয়েছিল: ইস, আমি কি এত সুন্দর দেখতে?

একসঙ্গেই দুজনে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পাশ করেছিল। চন্দনা হালদারের নাম একেবারে প্রথম। সবারই ঈর্ষার কারণ। কিন্তু অভীক তো ঈর্ষা করেনি। সে তো চন্দনাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। অভীকের রেজাল্টও কিছু খারাপ হয়নি। তবে চন্দনার কাছে সে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। অভীকের বাবার তাগিদে সে তাড়াতাড়ি বাবার চেম্বারে কাজ শুরু করে দিল। চন্দনা ফরেন স্কলারশিপ পেয়ে গেল। বাইরে যাবার আগেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। অভীকের বাবা বলেছিলেন, বেশ তো, দুজনে মিলেই আমাদের চেম্বার, নার্সিং হোমে লেগে যাও। শমীক তো সবে স্কুল ফাইনাল দিল,

ডাক্তার হতে অনেক দেরি। চন্দনা বাইরে থেকে এসে অভীকের পাশেই বসেছিল। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল? সেই তো সেদিন থেকে কতদিন কি ভাবে কেটেছিল, একটার পর একটা ছবি ভেসে ওঠে অভীকের চোখের সামনে। মনের মধ্যে গুমরে গুমরে ওঠে: চন্দনা, তুমি কী? কার উপর অভিমান করলে চন্দনা? তুমিই না বলতে ভালবাসা সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে? বাইরের পরিবেশের চাপে আমি যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। গতানুগতিক অহমিকার চাপে নিচে নেমে গিয়েছিলাম, তুমি তো নেমে যাওনি। তুমি কেন হাত ধরে টেনে তুললে না আমাকে? কেন আমাকে সরে আসতে দিলে? কেন? কেন?...একটা চাপা শব্দ আটকে থাকে অভীকের গলায়।

সন্ধ্যা ধড়মড় করে উঠে বসে। অভীকের কাঁধে হাত রাখে। বলে: কি হলো তোমার? আবার মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ল নাকি? অমন করছ কেন? ওঠ ঘুমের ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়।

ওয়ারিশ

চশমাটা নাকের উপর টেনে নিয়ে সোজাসুজি গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন দীপংকর সেন। ব্যাংকের কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী সান্যাল। গরিব গৃহস্থ ঘরের বৌ। শাঁখা, সিঁদুর, অতি সাধারণ ছাপা শাড়ি। খেটে খাওয়া মানুষের সপ্রতিভ চেহারা, যেমন দেখা যায় পথে ঘাটে সর্বত্র। এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে, যার মধ্যে আত্ম-মর্যাদা ফুটে ওঠে, মানুষকে আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝেই আসে বেলেঘাটা পাড়ার এই ব্যাংকে। অল্প স্বল্প টাকা রেখে যায় তার এস-বি অ্যাকাউন্টে। অনেকদিন থেকেই আসছে। ব্যাংকের স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট দীপংকর সেনও অনেকদিন দেখছেন তাকে। কিন্তু মনে রাখবার মতো বা লক্ষ্য করবার মতো এমন কিছু নেই তার মধ্যে। এ রকম অনেকেই আসে। মুখ চেনা, এই যা। ছোট ছোট অ্যাকাউন্টে অনেক মেয়েই তাদের সামান্য রোজগার থেকে একটু একটু করে সঞ্চয় করে থাকে।

কিন্তু আজ তো দীপংকরবাবুর হিসাবে মিলছে না। এ মেয়ে বলে কি? ঠিক শুনছেন তো? নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন: কি বললে মা? তোমার স্বামী—।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, আমার স্বামী নেই। মাথায় সিঁদুর দেখে কি ভাবছেন? ও আমি এমনিই পরি।

সোজাসুজি দীপংকরবাবুর চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল গায়ত্রী। দীপংকরবাবু স্নেহের সুরে বললেন: আচ্ছা মা, বুঝেছি। কিন্তু আইনের ব্যাপার তো। কি করা যায়, কোন পথ বের করতে পারি কিনা দেখব। তোমার কাছ থেকে সব জানতে হবে আমাকে। তাহলে তুমি কাল সকালে দশটা নাগাদ এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ঐ উপরে আমার আপিস ঘরটায়। তোমার দরখাস্তটা তখনই হাতে করে নিয়ে এস, ভেবে দেখব। গায়ত্রীর দরখাস্তটা তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন দীপংকরবাবু।

পরিষ্কার বাংলা হাতের লেখা। ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে

গায়ত্রী : আমার মৃত্যুর পর যেন আমার এ্যাকাউন্টের সব টাকা আমার একমাত্র পুত্র রতন সান্যালকে দেওয়া হয়। সেই যেন আমার একমাত্র ওয়ারিশ হয়।

কিন্তু রতনের বয়স মাত্র দশ বছর। নাবালক পুত্রের অভিভাবক তো মায়ের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই তার পিতা হবে। গায়ত্রী স্পষ্টই বলছে, তার স্বামী নেই। অথচ সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। এ কোন রহস্য? কি গভীর বেদনা গায়ত্রীর মতো অমন কাঁচা বয়সের মেয়েটির? বয়স তো এখনো ত্রিশ পেরোয়নি নিশ্চয়ই। তবে? দীপঙ্করবাবুর মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। একটা পথ তাহলে বের করতে তো হবে।

আপনি আমার গুরুজন, পিতৃতুল্য। আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই। আমার যে শাঁখা সিঁদুর দেখছেন, এসবই মিথ্যে। আমার বিয়ে হয়নি। মানুষের সামনে সধবা সেজে থাকি। না হলে নিন্দে হবে, ছেলেটার পিতৃপরিচয় থাকবে না। লোকের কাছে কি বলব? তাই এই মিথ্যে সাজ।

দীপঙ্করবাবু স্নেহের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু মা, তোমার ছেলের পিতা তো একজন আছেন, তিনি কোথায়?

গায়ত্রী সোজা দীপঙ্করবাবুর দিকে চোখ তুলে চাইল। সে চোখে লজ্জা, ভয় বা দ্বিধা নেই। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি পোড় খাওয়া মানুষের নির্মোহ দৃষ্টি। গায়ত্রী স্পষ্ট গলায় বলল: তবে শুনুন, তখন আমার বয়স সতেরো-আঠেরো। বেলেঘাটায় যে বাড়িতে এখন আমি ছেলে নিয়ে আছি, সেই বাড়িতেই ছিলাম। আমার দাদা শংকর, আমি, আমার মা আর বাবা। বাবা ছিলেন কাঠের মিস্ত্রি। আমাদের বস্তিবাড়ির লাগোয়া তাঁর একটু দোকান ঘর ছিল। তাতেই চলত আমাদের। দাদা আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। আমরা দুজনেই পাড়ার ইস্কুলে পড়তাম। দাদা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করল। আমি ক্লাস টেনে উঠলাম। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। সব উলটো পালটা হয়ে গেল। সংসার চলে না। মা অনেকদিন ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন। একটা অঙ্গ পক্ষাঘাতে পড়ে গেল। একেবারে শয্যা নিলেন। আমাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। আমি রাতদিন ঘরের কাজ করি, আর মায়ের সেবা করি। দাদা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল। বাবার কাঠের দোকান বিক্রি হয়ে গেল। তাতে অল্পদিন চলল।

আমাদের বস্তি পেরিয়ে বড় রাস্তার ওধারে মস্ত বড় পুরনো দোতলা বনেদি বাড়িতে ছিল দাদার বন্ধু অশোকরা। ঐখানেই মা আর ছেলে থাকত। ওদের ভাগে দুটো ঘর পড়েছিল, সেখানে ঐ বাড়িতেই ওদের আরও শরিকরা থাকত।

দাদার ঐ বন্ধু অশোক সান্যালই আমার সব সর্বনাশের মূল। তাই তো আমার নাম দেখছেন গায়ত্রী সান্যাল, আর ছেলের নাম রতন সান্যাল। আমরা কিন্তু আসলে সরকার। বাবা ছিলেন শীতল সরকার। দেশ ভাগের পর এসেছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুর থেকে। বংশের পেশা কাঠের মিস্ত্রির কাজ করছিলেন। কি দিয়ে কি হয়ে গেল...।

গায়ত্রী হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল। যেন কত কষ্ট হচ্ছে তার কথা বলতে। দীপংকরবাবু বললেন: একটু জল খাবে? চা? বেল টিপে বেয়ারাকে জল আনতে বললেন। বেয়ারা জল নিয়ে এলে গায়ত্রী ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলল। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। একটু পরে বেয়ারা দু'কাপ চা নিয়ে এল। দীপংকর বাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন: খাও, চা খেয়ে শান্ত হয়ে কথা বল মা, তোমাকে তো শক্ত হতেই হবে।

গায়ত্রী বলে চলল, আমি শক্তই আছি বড়বাবু। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে শক্তই রয়েছি। কিন্তু এখন যে আবার এক নতুন বিপদ। তাই তো আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি। পরের বাড়ি রান্না করে অতি কষ্টে যে কটা টাকা জমিয়েছি, তা যেন আমার নাবালক ছেলেটা পায়। হ্যাঁ যা বলছিলাম, অশোকদা দাদার সাথে পড়ত। অশোকদা আমার মাকে মাসীমা বলে ডাকত। মাও তাকে ছেলের মতো দেখত। ঘরের ছেলের মতো ব্যবহার করত। বাবা মারা যাবার পর আমাদের জন্য অনেক করেছে। তারই চেষ্টায় পাড়ার সিনেমা হলে টিকিট কাউন্টারে বসে টিকিট বিক্রি করার চাকরিটা দাদা পেয়েছিল। তাই দিয়েই কোনমতে আমাদের সংসার চলত। দাদা মাঝে মাঝে আমাদের জন্য সিনেমার টিকিট আনতো, আমরা একসঙ্গে সিনেমায় যেতাম। এমনি করেই মেলামেশা ঘনিষ্ঠ হতে থাকল। আমাদের মধ্যে একরকম পাকা কথাই হয়ে গেল। অশোকের সঙ্গে তো আমার বিয়ে হবেই—এ ছাড়া অন্য রকম ভাবতে পারিনি। ও বলত, বিয়ে তো আমাদের হবেই, তবে তুমি অমন আড়ষ্ট হয়ে থাক কেন, সহজভাবে মিশতে দোষ কি? অশোক একদিন মাকেও বলেছিল, মাসীমা গায়ত্রীকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমার মা এখন কাশীতে তীর্থে গেছেন, মা ফিরলেই একটা পাকা কথাবার্তা বলা হবে। মা একটু আমতা আমতা করে চুপ করে গেলেন। মায়ের মনে আশংকা হয়েছিল। মা ওর কথা বিশ্বাস করেননি। আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, দেখ আমরা গরিব মানুষ। ওরা বনেদি ঘর। মায়ের একমাত্র ছেলে। তাছাড়া জাতের মিল নেই। ওরা ব্রাহ্মণ, উঁচু ঘর। ওরা কিছুতেই রাজি হবে না। তুই ওদিকে হাত

বাড়াস নে। ভাবিসনে মা, তোর মামারা ঘর বর দেখেশুনে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

আমার মামারা থাকেন নদীয়া জেলায় বেথুয়াডহরিতে। বড় মামা স্কুল মাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। মা ওদের একমাত্র ছোট বোন। তাই মাকে খুব ভালবাসতেন।

সেবার মার টাইফয়েড হলো। প্রায় একমাস ভুগে বিছানার সঙ্গে লেগে গেলেন। আমি রাতদিন সেবা যত্ন করতাম। দাদার সঙ্গে সঙ্গে অশোকও ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, সবই করত। পাশের বাড়ির কিরণ মাসীমারা আমাদের জন্ম থেকে দেখছেন, খুবই আপনার মতো করেছেন। মা একটু সারলে বড়মামা এসে মাকে নিয়ে গেলেন। বললেন, মাস দুই তাঁদের কাছে রেখে সুস্থ করে পাঠাবেন। দাদা চাকরি করে, তাই আমাকে রান্নাবান্না, ঘরের কাজের জন্য থাকতেই হবে। আমি আর দাদা থেকে গেলাম। কিরণ মাসীমারা আমাদের দেখাশোনা করতেন। রাত্রে মাসীমার মেয়ে সন্ধ্যা আমার কাছে থাকত। পড়াশুনা করত, আমার বন্ধু ছিল। বারো ক্লাসে পড়ত। আমরা আগে স্কুলে একসঙ্গেই পড়তাম।

তারপর ? তারপরই তো আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। অশোক রোজ দুপুরে আসত। আমার সঙ্গে মিশতে চাইত, বলত: আমরা তো বিয়ে করবই, মাসীমা ফিরে এলে। তবে আর তোমার আপত্তি কেন ? আমি বলতাম আগে বিয়ে হোক। কিন্তু ওকে এড়ানো যেত না। দাদা বুঝতে পারত। মনে মনে বিরক্ত হতো, কিন্তু অশোককে কিছু বলতে পারত না।

কি দিয়ে কি হয়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার, আমি আর সন্ধ্যা দুপুরে বসে টি ভি দেখছিলাম। দাদা বাইরে কোথায় যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ অশোক এসে দাদাকে টেনে নিয়ে কি সব যেন বলল। আয় শংকর, তুই সামনে দাঁড়া। সাক্ষী রইলি, তুই নিজের দাদা, আর সন্ধ্যা, তুমিও থাক। আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলল, এই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল, বলেই আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিল। আমি হকচকিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে ঘটে গেল। দাদাও হতভম্ব হয়ে গেল। সন্ধ্যা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। অশোক জোর দিয়ে বলল, বুঝলি শংকর কোন চিন্তা নেই তোদের, সবাই জানে আমাদের ভালোবাসার কথা। আজ থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রী। মাসীমা ফিরে এলে অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান করে ঘটা করে বৌ নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে। আমার মুখ দিয়ে কথা সরল না। ধপাস করে বসে পড়লাম পাশের চৌকির উপর। সন্ধ্যা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। এতক্ষণে দাদার সম্বিত ফিরল। দাদা রেগে উঠল, এ সব কি কাণ্ড

অশোক? তোদের যদি বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল, তবে মা ফিরে আসুক। এ সব কি অসভ্যতা? দাদার সঙ্গে অশোকের কথা কাটাকাটি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অশোক বেরিয়ে গেল। দাদা আমাকে বলল, যত সব বাজে ব্যাপার, ও সব সিঁদুর-টিঁদুর মুছে ফেল, অশোককে আমি দেখে নেব। দাদা একটু পরে চলে গেল। আমি একলা বসে অঝোরে কাঁদতে থাকলাম।

তারপর? তারপর যা হবার তাই হলো। সে আসত। আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতই মিশতাম। আমি তাকে স্বামী বলেই মনে করেছিলাম। আমার কি দোষ বড়বাবু?

দীপংকরবাবু তাঁর সাদা-কালো চুলের মধ্যেই আঙুল চালাতে চালাতে বললেন: দোষ গুণের কথা নয় মা, আমাদের সমাজে যা হয়ে থাকে—। গায়ত্রী বলে চলল: মা ফিরে এসে সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—কি সর্বনাশ! কিন্তু কি জানি কেন, অশোক আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল। মা তাড়াতাড়ি মামাকে ডেকে পাঠালেন। মামা এসে সব শুনলেন, মামা অশোকের বাড়ি গিয়ে তার মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে গেলেন। ওর মা এক জাঁহাবাজ মহিলা। গোটা দুই বাড়ির মালিক। বাড়িভাড়ার হিসাবপত্র নিজেই দেখতেন। আত্মীয় স্বজন সবাই ওকে ভয় করে চলত। উনি নাকি খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ে ছিলেন। তাই বড় দেমাক। আমার মামার সঙ্গে উনি কথাই বললেন না, পরিচয় দিতেই মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন, শুধু বললেন অশোক বাড়ি নেই।

তারপর থেকেই অশোক আর আসত না আমাদের বাড়িতে। দাদাও তাকে খুঁজে খুঁজে পেত না। দিন যেতে লাগল। আমার শরীরের লক্ষণ দেখে মা আঁতকে উঠল—সর্বনাশী, এ কি করলি! লোকের সামনে মুখ দেখাব কি করে? আমি তখনও জানি, অশোক তার কথা রাখবে, সে আসবে। আমার এ অবস্থা জানলে তাড়াতাড়ি অন্ততঃ রেজিস্ট্রি বিয়েটা করে নেবে এ বিশ্বাস আমার ছিল। দাদা, মামা, পাশের বাড়ির কিরণ মাসীমা ওদের বাড়ি ছোটাছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু অশোকের দেখা নেই। একদিন নাকি দাদার সঙ্গে পথে কোথায় দেখা হয়েছিল। দাদার কাছে আমার অবস্থার কথা সব শুনে নাকি বলেছিল, আমি মাকে নিয়ে মামার বাড়ি যাচ্ছি। ক'দিন পর ফিরে এসেই তোদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু অশোক আর আসেনি, ওকে ওর বাড়ির লোকেরা কোথায় যেন সরিয়ে দিল। দাদা রেগে বলল, পুলিসে খবর দেব। মামা বলল, মামলা করব। মা কান্নাকাটি করতে লাগল। কিরণ মাসীমা আর একজন আমাদের প্রতিবেশী আশা বৌদির সঙ্গে মা আমাকে পাড়ার লেডি ডাক্তার জ্যোৎস্না রায়ের

কাছে পাঠালেন পেটেরটা নষ্ট করে দেবার জন্য। ডাক্তার দিদিমণি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন, আর ভরসা নেই, পাঁচ মাসে পড়েছে, এখন আর নষ্ট করা যাবে না। যা হবার তা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এস, আমি দেখব। আমাদের হাসপাতালে টিকিট করে প্রসবের ব্যবস্থা করে দেব, ফ্রি বেডেরও ব্যবস্থা করে দেব। সে যে কি লজ্জা, কি দুঃখের মধ্যেই একটা একটা দিন কাটতে লাগল, ভাবলে এখনও শিউরে উঠি।

মামা আর দাদা রেগেমেগে উঠল। পুলিস দিয়ে জানোয়ারটাকে খুঁজে নিয়ে এসে পাড়ার লোকের সামনে জোর করে বিয়ে দেব। একদিন থানা থেকে একজনকে নিয়েও এল। সে ভদ্রলোক মার কাছ থেকে আমার কথা সব শুনলেন। আর বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। তাকে খুঁজে আনবো। এবার তার বাড়িতে যাবার সময় মামার কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে চলে গেল। তারপর মামা কত ঘোরাঘুরি করল, থানায় গেলে ওরা হেসে উড়িয়ে দিত, যা তা বলত। মামা অবশেষে আর যেত না।

তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন। আমি প্রসব ব্যথায় ছটফট করছি। মা কপালে করাঘাত করছে। কিরণ মাসীমা আর আশা বৌদি ছুটে এলেন, ট্যাক্সি করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন সেই ডাক্তার দিদিমণি জ্যোৎস্না রায়ের কাছে। যাবার সময় কিরণ মাসীমা আমার সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন। বললেন মা, মনে রেখ তুমি সধবা। যে নিজের হাতে একদিন তোমাকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে, সেই তোমার স্বামী, তোমার সন্তানের বাবা। এই বলে মন শক্ত কর। হাসপাতালে যেন কেউ কোন সন্দেহ না করে। আমিও সেই থেকে সধবা সেজেই আছি। কেউ বলে স্বামী ত্যাগ করেছে, কেউ বলে আবার বে করেছে। যে যা বলে বলুক। রতন শুনেছে তার বাবা নিরুদ্দেশ, ফিরবে কিনা কেউ জানে না। সে আজ দশ বছর হয়ে গেল বড়বাবু। রতন হবার পরের বছরই মা মারা গেল। দাদা বিয়ে করে শিলিগুড়িতে চাকরি নিয়ে চলে গেল। বৌদিও একটা স্কুলে চাকরি করে। বৌদি আমাকে সহ্য করতে পারে না। আমার ছেলেটার নামও শুনতে পারে না। কোন দিনও আসেনি। দাদা মাঝে মাঝে আসত, টাকা পয়সাও কিছু দিত। আমার জন্য দাদারও কত কথা শুনতে হতো। দাদা অনেক দিন আসে না। তবে মামা কিন্তু যোগাযোগ রাখেন। ছেলেটার লেখাপড়ার সব খরচই দিয়ে থাকেন। মা চলে যাবার পর ছেলে নিয়ে আমি একাই থাকি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটি। তিনটে বাড়িতে রান্নার কাজ করি। ঐ কিরণ মাসীমাই কাজ দেখে দিয়েছেন। ঐ সামান্য রোজগার থেকেই আপনাদের

ব্যাংকে টাকা কটা জমিয়েছি ছেলের জন্য। ছেলে বড় হয়েছে। ক্লাস ফোর-এ পড়ে। ছেলেটার মাথা খুব ভাল। মাস্টার মশাইরা খুব ভালবাসেন, স্কুলের ফাংশানে গান করে, কবিতা বলে। তার মুখের দিকে চেয়েই বেঁচে আছি বড়বাবু।

গায়ত্রী হাঁপিয়ে উঠল। দীপংকরবাবু রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন : তা এখন আবার কি হলো? ব্যাংকে তোমার হাজার পনেরো টাকা হয়েছে দেখলাম। তোমার ছেলেই তো পাবে। নতুন করে লিখতে চাও কেন?

গায়ত্রী একটু থেমে বলল : সেই কথাই তো বলতে এসেছি। আজ আবার আমার নতুন বিপদ এসেছে। ওর বাবা অশোক সান্যাল কলকাতায় ফিরে এসেছে। অনেক দিন আগেই তার বিয়ে হয়ে গেছে। এতদিন বৌ নিয়ে বোম্বাইতে ছিল, ওর এক মামার কাছে। কি যেন করত। সেই মামা মারা গেছেন। ও বৌ নিয়ে মায়ের কাছে থাকবে বলে চলে এসেছে। ওদের বাড়িটা এখন অনেকতলা ফ্ল্যাট বাড়ি হয়ে গেছে। ওর ভগ্নিপতিই বাড়ির প্রমোটার। এখন আমার ভয়, যদি ও ছেলেকে দাবি করে বসে, আর—আর আমার কিছু হয়ে গেলে ও আমার স্বামী হিসেবে আমার ওয়ারিশ হয়ে আমার টাকাগুলো যদি তুলে নেয়! আমার ছেলেটার তাহলে কি হবে বড় বাবু? তাই আমি রেকর্ড করে রাখতে চাই যে আমার স্বামী নেই, আমি বিধবা। হ্যাঁ—সিঁদুর তো মুছে ফেলতেই হবে। কিরণ মাসীমাকে বলেছি, ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ছেলেকে কি বলব? ওর বাবা মরে গেছে? সে যদি পরে সত্যি কথা জানতে পারে? পাড়ার লোকে জানে। না না, এ বন্ধন আমার ছিঁড়ে ফেলতেই হবে। বড়বাবু, যাহোক কিছু একটা করুন। লিখুন আমার স্বামী নেই, আমার নাবালক ছেলেই আমার একমাত্র ওয়ারিশ, বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ করে যেটুকু বাঁচাতে পেরেছি যেন আমার ছেলেটা পায়—এটা আপনি দেখুন বড়বাবু।

দীপংকরবাবু পুরু কাচের চশমাটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে, ডান হাতে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে মাথা তুলে বললেন, শক্ত হও মা দেখি কি করা যায়। পথ একটা পাওয়া যাবেই। মন শক্ত কর মা।

প্রতিনিধি

শিবানী মাথার কাপড়টা সামলে মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আটসাঁট হয়ে বসল। বুঝতে পেরেছে যে সুরেন আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল, একটু অসন্তুষ্টই হয়েছে। শিবানীর খেয়াল ছিল না। মাথার কাপড়টা সরে গিয়েছিল। শিবানীর মেয়েটা হামা দিয়ে অনেকটা দূরে সরে গিয়ে কি যেন একটা মুখে পুরে দিয়েছে। শিবানী একমনে সবার কথাবার্তা শুনছিল। শিবানী অপ্রস্তুত হলো। আসার পথে সুরেন বারবার বলে দিয়েছিল: গাঁয়ের পাঁচজন গণ্যি-মাণ্যি মানুষের সামনে ভদ্দরভাবে বসবি। লাজলজ্জা রক্ষে করবি। ঘরের বৌ-এর একটা আবরু আছে তো? তোর মতো আরো একজন আসবে। ঐ আমাদের অঘোরের শালী। তোরা হলি গিয়ে ঐ যে বলে না—মনোনীত প্রতিনিধি। সে তুই বুঝবি নে। ওখানে যা বলা কওয়া আমরাই করব। তোদের একটু তফাতে একটা মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হবে। ভয় নেই কোনও। আমি কাছেই থাকব। খুকিটার জন্যি আঁচলের খুঁটে চাট্টি মুড়ি বেঁধে নিস, যদি বেলা দু'পর হয়ে যায়।

অঘোরের শালী আসেনি। তবে আজ আসার এমন কোন তাগিদও নেই। আজ ভোটাভুটির কোন বিষয় নেই। হাত তোলার কারবার নেই। কি জানি, তাই হয়তো অঘোর তাকে কষ্ট করে আর মিটিং-এর খবরটাই দেয়নি। যাকগে, আসলে শিবানী যে একা পড়ে গেল। শিবানী দেওয়ালে গা ঘেঁসে জড়সড় হয়ে বসেছে। একটু লজ্জা করছে বৈ কি। ঘরের বৌ সে, পুরুষ মানুষদের মুখোমুখি এমন করে তো আগে কখনো বসেনি। গাঁয়ের পাঁচজন জানাশোনা মানুষ বটে। শিবানী নিজের বেশভূষার দিকে একবার খেয়াল করে নিল। সকালেই টিনের সুটকেস থেকে পুজোর সময় পাওয়া তাঁতের ডুরে শাড়িখানা পাট ভেঙে পরেছে, চুলে তেল মেখে ফিতে কাঁটা দিয়ে যত্ন করে বেঁধেছে। কপালে সিঁথিতে টকটকে গোলা সিঁদুর। পান খেয়ে ঠোঁট লাল হয়েছে। দুহাতে দুগোছা প্লাস্টিকের চুড়ি। পায়ে হাওয়াই চটি। গাঁয়ের পাঁচজন গণ্যিমান্যি ঘরের মেয়েদের চেয়ে শিবানী কম কিসে? এখন তো তার নাম উঠে গেছে পঞ্চায়েতের খাতায়। শিবানীর মনে একটা খুশির হাওয়া খেলে গেল। এতদিন সুরেন একাই

আসত পঞ্চায়েতের মিটিং-এ। এখন থেকে শিবানীকেও নিয়ে আসবে। এখন সুরেনের বদলে শিবানীই নাকি মেম্বার হয়েছে। তবে সুরেন পুরুষ মানুষ, জানে বোঝে। আর সোয়ামী বলে কথা? তারই তো আসল দায়িত্ব সব। সুরেনও তা জানে, শিবানীও জানে। যা যা কথা কওয়া দরকার সুরেনই বলে দেবে। পুরুষ মানুষ, যারা ঘর সংসারের কত্তা, বাইরের কাজটাও তো তাদেরই সামাল দিতে হবে?

পঞ্চায়েতের মিটিং জমে উঠেছে। কি নিয়ে যেন বেশ তর্কাতর্কি বেধে গেল। শিবানী কান খাড়া করে। গাঁয়ে নাকি একজনকেও নিরক্ষর রাখা হবে না। ছেলে বুড়ো, মেয়েছেলে সবাইকেই লেখাপড়া শিখতে হবে। টিপ ছাপ আর চলবে না। সই না করলে কোন লোনও পাওয়া যাবে না। এতদিন সরকার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে স্কুল বসিয়েছে, ভাল কথা। যার মন চায় সে যায়, যার ঘরে কাজ আছে, ক্ষেতে খামারে কাজ আছে, সে যায় না। তবে এখন গাঁয়ের গরিবদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই যাচ্ছে স্কুলে। কিন্তু বুড়োগুলোর উপর আবার এ চাপাচাপি কেন? তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে। এখন কিনা টিপছাপ চলবে না, নাম সই করতে হবে। আবার মেয়েছেলেদেরও সবাইকে যেতে হবে লেখাপড়া শিখতে। এ কেমন কথা?

নবীন বাউড়ীর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। জোয়ান ছেলে। কৃষক সমিতি করে। জোর দিয়ে বলছেঃ কেন? কেন হবে না খুড়ো? সব গাঁয়ে হচ্ছে, আর আমাদের গাঁয়ে হবে না? তুমি বলছ, মেয়েছেলেরা পারবে না। কেন পারবে না? ঐ তো শিবানী বৌদি রয়েছেন। শিবানীর দিকে তাকিয়ে নবীন বললঃ আপনি কি বলেন বৌদি?

শিবানী চমকে উঠল। সুরেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলঃ আমি, আমি বলছি। ও মেয়েছেলে. কি বলবে? ওদের কথা হলো, আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, তাই শুনবে। তবে কিনা মেয়েছেলেদের শেখার কথাটা—। সবাই গলা চড়িয়ে তর্কাতর্কি লাগিয়ে দিল। শিবানী মেয়েটাকে কোলের কাছে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

মিটিং শেষ হলো। একটু দূরে একটা টেবিল চেয়ারে বসা রমা ডেকে বললঃ এই যে এদিকে, যার যার টাকা নিয়ে যাবেন। পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা মিটিং-এ এসে পাঁচ টাকা করে পায়। অন্ততঃ যাতায়াতের খরচটা তো ওঠে। সুরেন এগিয়ে গেলঃ এই যে আমাকে দিন, আমি এর হয়ে নিচ্ছি।

রমাঃ তা তো হবে না দাদা, যে প্রতিনিধি তাকেই সই করে টাকা নিতে হবে।

সুরেনঃ সই কি করে করবে, মেয়েছেলে? আমি সই করছি।

রমা : সই না করতে পার এস শিবানীদি, ধর, এখানে টিপ সই দাও এবারের মতো। আর শোন, তুমি কাল থেকেই সন্ধেবেলায় আমাদের সাক্ষরতার স্কুলে যেও। ক'দিনেই নাম সই করা শিখে যাবে। ঐ তোমাদের বাড়ির কাছেই মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে সন্ধেবেলায় বসে মেয়েদের সাক্ষরতা স্কুল। তোমার নাম আমি দিয়ে রাখব। শিবানী ঘাড় নাড়ে। সুরেন আমতা আমতা করে। মহামুশকিলে পড়া গেল যা হোক। ঘরের বৌঝিরা এত পারবে কেন?

বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে ওরা। সুরেন লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে আগে চলেছে। খানিকটা দূরে মাথায় ঘোমটা দেওয়া মেয়ে কোলে শিবানী তাকে অনুসরণ করছে। গাঁয়ের পথে কি স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি চলতে পারে? পাঁচজন বলবে কি?

রাত্রে শিবানী সুরেনকে জিজ্ঞেস করে: আচ্ছা, ঐ যে টাকা দিল, সে মেয়েছেলেটার বে হয়নি?

সুরেন : তা হয়েছে বৈ কি।

শিবানী : সোয়ামী নেই ওর?

সুরেন : আছে বটে।

শিবানী : তা'লে ওর সংগে আসেনি কেন? ওকে একা ছেড়ে দিয়েছে কেন গা?

সুরেন : ওদের ওরকম হয়। চুপ করতো, ঘুমোতে দে।

শিবানী : ঐ যে আমারে বলল সনজে বেলায় লেখাপড়া শিখতি যাবার কথা?

সুরেন : বলুক তো। ওরা এক-রকম, আমরা এক-রকম। আমার দাদা শুনলি, মা শুনলি কি কবে? ঘরের কাজ নেই? চাষের সময়। গরু-বাছুর আছে, কচি-কাচা আছে। ঘর সংসার নেই? ওখানে তোর নাম আছে তাতে কি? যা করার আমি করে দেব। যে দিন, যে দিন ভোট দিতি হবে, আমি তোরে সংগে করে নিয়ে যাব।

মেয়েটা কেঁদে উঠল। শিবানী তাকে সামলাতে লাগল। সুরেন কখন ঘুমে অচেতন। শিবানীর চোখে ঘুম নেই। ঐ যে টেবিল চেয়ারে বসে টাকা দিল, ঐ মেয়েছেলেটা কি করে? ওর সোয়ামী কেন ওরে কিছু বলে না? যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়ায়? মাইনে পায় বুঝি? কি জানি—।

সেদিন সকাল গড়িয়ে গেছে। রোদ জ্বলছে দপ দপ করে। সুরেন মাঠ

থেকে ফিরে এসে এক ঘটি জল আর এক থালা মুড়ি নিয়ে দাওয়ায় বসেছে। মেয়েটা পাশে বসে একটা একটা মুড়ি খুঁটে খুঁটে গালে পুরে দিচ্ছে। শিবানী গাছকোমর করে শাড়ি পরে উঠোনে ধান শুকোচ্ছে।

হঠাৎ দলবল নিয়ে ঢুকলেন গ্রামের মহিলা সমিতির সরলাদি। সঙ্গে মালতী, রমা, আমিনা। আমিনার মাথা থেকে লম্বা কালো বোরখা ঝুলছে। মুখের উপর থেকে বোরখার ঢাকাটা সরানো। পদ্মফুলের মতো ফুটফুটে মুখখানা। চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে। কোলে একটা ছয় মাসের ছেলে। হাত ধরে আছে একটা বছর দশ বারো বয়সের মেয়ে।

সরলাদি বললেন, চল শিবানী, আমাদের সঙ্গে চল। এখুনি যেতে হবে ঐ ওপারের মৌলবী সাহেবের কাছে। দরবার করতে হবে আমিনার জন্যে। সরলাদি এক নিঃশ্বাসে ঘটনাটা বলে গেলেন। ঘটনা ঘটেছে আজই সকালে। বসির আর আমিনার ঝগড়া আজ চরমে উঠেছে। অশান্তি কি সব নিয়ে চলছিল অনেকদিন ধরেই। বসির দুবাই চলে যাবে। অনেক টাকা রোজগার করবে। অন্য মেয়ে নিকে করবে। আমিনাকে তার আর চাই না। তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে সকালেই। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে ছেলে মেয়ে সমেত। ঘরে তালা লাগিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। আমিনা ছেলে মেয়ে নিয়ে সরলাদির কাছে এসে কান্নাকাটি করছে। দুই ছেলেমেয়ের বাপ বসির। মুখের কথায় কি অমন তালাক হয় নাকি? ঐ ঘরের তালা খুলে আমিনাকে ঢোকাতে হবে। বাড়ি ছেড়ে যদি যেতে হয় বসির যাবে, আমিনা যাবে না। আর শিবানী তুই হলি গিয়ে আমাদের পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি। তুই সঙ্গে থাকলে আমাদের কথার জোর হবে। মৌলবী সাহেব আমাদের কথা শুনবেন।

আমিনাদের বাড়ি এ পাড়ায়ই। শিবানী আমিনাকে চেনে। তাদের ঝগড়াঝাঁটির কথাও জানে। পুকুরঘাটে দেখা হয় আমিনার সঙ্গে। আমিনা কোন কথা বলছে না। মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে শুধু। রমা আর মালতী সরলাদির কথার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন্তব্য জুড়ে জুড়ে দিচ্ছে।

শিবানী ছড়ানো ধানের মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে একেবারে কাঠ হয়ে শুনছিল সরলাদির কথা। তাড়াতাড়ি গাছ কোমর করা শাড়ির আঁচলটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসে। সুরেনের দিকে তাকায়। সুরেনেরও এতক্ষণে হুঁস হয়। বলে: বসেন দিদিরা, বসেন। একটা মাদুর বিছিয়ে দে। শিবানী তাড়াতাড়ি মাদুর এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দেয়।

সুরেন বলে, কথা তো ঠিকই। তা আপনারা মেয়েছেলেরা কি করবেন?

আমাদের পঞ্চায়েতকে বলেন। আমরা গাঁয়ের পাঁচজনের সালিসী ডাকি। কথাডা হলো গিয়ে—। সরলাদি সুরেনকে তার কথা শেষ করতে দেন না। বলেন: তোমরা যখন বসবে, তখন বসবে। এখন আমরা সোজা যাব মৌলবী সাহেবের কাছে, দেখি তার কাছে কি বিধান আছে। নে, শিবানী, দেরি করিস না। কাপড়টা ছেড়ে একটা ফর্সা কাপড় পরে আয়। শিবানী যন্ত্রচালিতের মতো ঘরের মধ্যে কাপড় ছাড়তে চলে যায়।

সুরেন কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, ও কি করবে? ঘরের বৌ, মেয়েছেলে—। বরং আমি—।

সরলাদি: না না, তা হবে না, তুমি গেলে হবে না। শিবানী যে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি। ওকেই যেতে হবে।

শিবানী কাপড় ছেড়ে চুল আঁচড়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে এসে দাঁড়াল। সুরেন তার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে কি তুই যাবি নাকি এনাদের সঙ্গে?

শিবানী: আমিনারে তালাক দিয়ে দেছে শয়তানডা। তুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে ও এখন যাবে কোথায় ঘর বাড়ি ছেড়ে? আমারে তো যেতিই হবে। আমি যে ওদের পতিনিধি—।

সুরেন অসহায়ের মতো বলে, তবে তাই যা। দেখিস মৌলবী সাহেব কিন্তু মানী লোক। তার সামনে কি মেয়েছেলেরা—।

সরলাদি: চল, আর কথা বাড়াস না। চল আমিনা। রমা, মালতী—চল যাই। শিবানী নেমে এসে আবার দাওয়ার দিকে ফিরে তাকায়, বলে—মেয়েটা?

সুরেন বলে: সে তোর ভাবতি হবে না। পিসি আছে।

ওরা চলে গেল। সুরেন মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখল, শিবানী হাঁটছে আমিনার হাত ধরে। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল মনে হচ্ছে সুরেনের। কানের মধ্যে তার বাজছে শিবানীর স্পষ্ট কথা—আমারে তো যেতিই হবে—আমি যে ওদের পতিনিধি—।

ও কথা কি বলতে আছে ?

মানুষটা গেল কোথায় ? এই বলল ভাত বাড়, খিদে পেয়েছে। ভাত বেড়ে বসে আছি। হঠাৎ কি মনে হলো, হুট করে বেরিয়ে গেল। পিছন ফিরে দেখি আর নেই। না, আর পারি না।

শান্তি অধৈর্য হয়ে ওঠে, ভাতের থালাটার উপর একটা ঢাকা দেয়। লম্ফটা একটু উস্কে সরিয়ে রাখে। ঘুমন্ত মেয়েটার গায়ের কাঁথাটা টেনে দেয়। দরজার বাইরে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে। না, কোথাও নবীনের দেখা নেই। ঘরের মেজেতে পোস্টারের বাণ্ডিলটা খোলা পড়ে আছে। বলেছিল, পোস্টার মারতে যেতে হবে মদনদের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি ভাত দে, একেবারে খেয়ে-দেয়ে বেরব। আবার লণ্ঠনটাও হাতে করে নিয়ে গেছে। কোথায় গেল, কিছু তো বলে গেল না। শান্তি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটার গায়ে হাত দিয়ে আবার দেখে। মাথায় কাপড়টা টেনে, বাইরে থেকে ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় গেল নবীন ? হয়তো ওধারের পুকুরে হাত পা ধুতে গিয়ে কারো সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে, নয়তো রাস্তার ওধারের গোলদারির দোকানে গিয়ে বসেছে। তবুও শান্তির মন মানে না। শান্তি এক পা এক পা করে এগোতে থাকে নবীনের খোঁজে।

পোস্টারের দিকে তাকিয়ে নবীনের মনে হলো, হ্যাঁ, সব যুক্ত অক্ষরগুলোই সে চেনে। সবগুলো অক্ষর সে লিখতেও পারে। তবে ? তবে লিখে দেখাবে কি শান্তিকে ? কত বড় মাস্টার হয়েছে শান্তি ? নবীনই বা কম কিসে ? হাসি পেল নবীনের। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, একটা পোস্টার আর লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ঝট্ করে বেরিয়ে পড়ল। একটা দেওয়াল তো চাই ? পছন্দ মতো একটু দেওয়ালের জায়গা। বাড়ির পিছনের পুকুরপাড়ে সরকারদের পোড়ো ভিটেটার ভাঙা দেওয়ালে বেশ লেখা যাবে। কিন্তু কি দিয়ে লিখবে ? রং তুলি কোথায় ? বুদ্ধি একটা এলে তার সঙ্গে আর একটাও আসে। পাড়ার ছেলেদের ক্লাব ঘরে গিয়ে একটা গোলা লাল রঙের কৌটো আর একটা তুলি চেয়ে নিয়ে এল

নবীন। আর একবার লন্ঠনটা উঁচু করে ধরে পোস্টারের সবকটা অক্ষরের উপর চোখ বুলিয়ে নিল : পঞ্চায়েত নির্বাচনে শান্তিলতা মন্ডলকে ভোট দিন। হ্যাঁ, পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। নবীন একবার যুক্ত অক্ষরগুলোর উপর হাত বুলিয়ে নিল।

তা এক বছর ঘুরে আর এক বছর ঘুরতে চলল বৈ কি? নবীনের ঘরে তখন মা ছিল। ছোট বোন আন্না ছিল। মাসকয়েক আগেই শান্তির সংগে তার বিয়ে হয়েছিল। শান্তি তাদের পাশের গাঁয়ের মেয়ে। ক্ষেতমজুর ঘরেরই মেয়ে। নবীনের বাবা মহাদেব আর শান্তির বাবা গোপাল এক মাঠেই চাষ করত। একসংগেই কৃষক সভা করত। একসংগে পঞ্চায়েত করত। নবীনের বাবা মারা গেলে শান্তির বাবা গোপাল কতবার নবীনদের বাড়ি এসেছে, খোঁজ খবর নিয়েছে। সেই গোপাল কাকার মেয়ে শান্তিকে ঘরে এনে নবীন সুখী হয়েছে। মাঝখানে একটা ঝামেলা হয়ে গেল এই যা। তবে নবীন তো আর ইচ্ছে করে করে নাই। নবীন তো শান্তিকে কত ভালবাসে। শান্তি গুনের মেয়ে। লেখাপড়া জানা বৌ কজনের ভাগ্যে জোটে?

মেজাজটা সেদিন নবীনের হঠাৎই বিগড়ে গেল। তার জন্য নবীন কি করবে? পেটে আগুন জ্বললে কি মেজাজ সামলানো যায়? মনে মনে তার আপসোস হয় বৈ কি? বিশেষ করে ঘরের কেচ্ছা পাঁচজনের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে কেমন লাগে? তবে শান্তি আসলে খুব ভাল মেয়ে। নবীনকে সে খুব ভালবাসে। কত যত্ন করে। করবে না কেন? আর পাঁচটা মেয়ের মতো তো মুখ্যু নয়? লেখাপড়া শিখেছে যে। বই পড়তে পারে। খবরের কাগজও পড়তে পারে।

বিয়ের আগেই শান্তি তাদের গাঁয়ের সাক্ষরতা স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিল। খুব মাথা ছিল তার। মাস্টার দিদি তার বাবাকে বলেছিল, এ মেয়েকে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দাও গোপাল, ওর মাথা আছে। আরো লেখাপড়া শিখুক। কিন্তু গোপাল তা কি করে করবে? ঘরে বৌ নেই, ছোট ছোট ভাই বোন, গোপালের বুড়ো মা। ঘরের কাজ কে সামলাবে? শান্তিই তো সারাদিন সব করতো। সন্ধে বেলায় সাক্ষরতার স্কুলে যেত। সেটা শেষ হয়ে গেলে ঘরে বসেই একটু আধটু লেখাপড়া করত। ভাইবোনকে শেখাত। মাস কয়েক পরেই শান্তির বিয়ে হয়ে যায় নবীনের সংগে। গোপাল তার বন্ধুর ছেলে নবীনের হাতে শান্তিকে দিয়ে খুশি হয়েছিল। নবীন তার বাপের জায়গায় ক্ষেতমজুরের কাজ করে।

লেখাপড়া শেখে নি। তাতে কি? ক্ষেতমজুরের কাজে আবার লেখাপড়ার কি দরকার? আর, তার রোজগারেই তো সংসারের পেট চলে।

কিন্তু তবু দরকার আছে। সব গ্রামের মতো নবীনদের গ্রামেও শুরু হয়ে গেল সাক্ষরতার স্কুল। পুরুষদের স্কুল, আবার মেয়েদেরও স্কুল। পাড়ায় পাড়ায় ধুম পড়ে গেল মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো সবার লেখাপড়া শেখার। নবীনদের পাড়ার প্রাথমিক স্কুলে সন্ধেবেলায় মেয়েদের সাক্ষরতার স্কুল বসে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবিত্রীদি এসে শান্তিকে ডেকে নিয়েছিল ঐ স্কুলে। শান্তি কদিনের ট্রেনিং নিয়ে সেখানে যেতে শুরু করল মেয়েদের শেখাতে। নবীন কিছু বলে নি। নবীনের মা প্রথমে আপত্তি করেছিল। ঘরের কাজকর্ম ফেলে বৌ আবার স্কুলে যাবে কেন? কিন্তু সাবিত্রীদিরা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়েছিল সপ্তাহে তিনদিন করে শান্তি যাবে বলে। নবীনের বরং লেখাপড়া জানা বৌ-এর জন্য মনে গর্বই ছিল। তার কোদাল কুড়ুল কাস্তের পাশেই মাটির দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে শান্তি তার বই স্লেট খাতা রাখত। নবীনের ভালই লাগত।

কিন্তু কত আর সহ্য করা যায়? ক্রমশ নবীনের মনে হয় শান্তি তাকে অবহেলা করছে। মুখ্যু স্বামী নিয়ে বুঝি মন ভরছে না? তার মা বোনকেও ভাল করে দেখে না। ঐ লেখাপড়ার নেশাই তার কাল হয়েছে। বোনটাকে পটিয়েছে। শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সেও সাক্ষরতা স্কুলে যায়। নবীন সারাদিন খেটে এসে প্রায়ই ওদের কাউকেই দেখতে পায় না। মা বলে, ঐ গুড় মুড়ি আছে, হাত পা ধুয়ে খা। নবীন খায় আর মনে মনে গজ গজ করে। আবার এক একদিন রাত্তিরেও নবীন একাই ঘুমিয়ে পড়ে। শান্তি আর তার বোন আন্না লম্ফ জেলে লেখাপড়া করে। নবীনের মনে হয় শান্তির বড় দেমাগ হয়েছে। লেখাপড়ার দেমাক! ইস! কিন্তু পেট? পেট চালায় কে? এই মুখ্যু স্বামীর রোজগারেই তো পেট চলে। তবে? তবে এত দেমাক কিসে। সারাদিন রোদে পুড়ে, জলে ভিজে গতর খাটিয়ে নবীন সংসার চালায়, আর তার দিকেই কিনা কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই? মেয়েমানুষের এত বাড় ভাল নয়।

নবীন গুমড়ে গুমড়ে থাকে। কথায় কথায় রাগারাগি করে। শান্তি বুঝতে পারে নবীন তার উপর বেশ বিরক্ত হয়ে উঠছে দিন দিন। শান্তি বুঝতে পারে যে লেখাপড়াটাই তার কাল হয়েছে। নইলে সারাদিন এত খাটুনি খেটে, সবার সেবাযত্ন করেও তার মন পায় না কেন? প্রথম প্রথম শান্তি নবীনকে বলত: তোমার মতো কত লোকই তো মাঠের কাজ সেরে এসে সাক্ষরতার স্কুলে যায়, তুমি

যাও না কেন ? নবীন তার কথায় কান দিত না। এখন আর শান্তি কিছু বলতে সাহস পায় না। নবীন কথায় কথায় ক্ষেপে ওঠে। একদিন সকালেই মাঠে যাবার আগে পান্তা খেতে বসে সামান্য কি কথার উপর কথা। নবীন রাগ করে পান্তার থালাটা পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গটমট করে চলে গেল। শান্তি তো একেবারে ভয়ে ভয়ে চুপ করে রইল, পাছে তার লেখাপড়াটাই বন্ধ হয়ে যায়।

হঠাৎ সেদিন কি হলো নবীনের। সন্ধের পর রান্নাবান্না সেরে শান্তি বসেছে আন্নাকে নিয়ে। আন্না কিছুতেই 'বিদ্যাসাগর'-এর 'য' ফলাটা লিখতে পারছে না। শান্তি বারবার দেখাচ্ছে। নবীন কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল: ভাত দে, খিদে পেয়েছে। শান্তি 'য' ফলাটায় টান দিতে দিতে উঠি উঠি করছে। নবীন আবার রেগে বলল: শীগগীর ভাত বাড় বলছি, কানে যাচ্ছে না ? শান্তি ধড়মড় করে উঠতে উঠতেই নবীন তার উপর দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তোর লেখাপড়ার নিকুচি করেছে—বলে শান্তির চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে ফেলে দিয়ে বেধড়ক কিল, চড়, লাথি চালাল। লাথি মেরে ভাতের হাঁড়ি কড়া সব উল্টে ফেলে দিল। শান্তি আর আন্নার বইগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আন্নাকেও কষে থাপ্পড় মারল। আন্না চিৎকার করে কেঁদে উঠল। শান্তি চৌকাঠের উপর পড়ে গেছে। কপাল কেটে দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে। শান্তির গোঙানি আর আন্নার কান্না শুনে পাশের বাড়ি থেকে নবীনের মা ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল: আহা, আহা, কি সব্বোনাশ! বৌটা যে পোয়াতি।

নবীন ততক্ষণ বেরিয়ে চলে গেছে। চেচাঁমেচি শুনে পাড়ার লোক কেউ কেউ এসে হাজির হয়েছে। আন্নার কি মনে হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে সাক্ষরতা স্কুলের সাবিত্রীদিকে ডেকে এনেছে—শীগ্‌গীর এস, আমার বৌদিকে বাঁচাও।

সেই বিভীষিকাময় ঘটনার কথা ভুলতে পারে না নবীন। এখনো আতংকে শিউরে উঠে। শিউরে ওঠে শান্তিও। সে-ই বা ভুলবে কেমন করে ? তার কপালের কাটা দাগটা যে এখনো তার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে। শান্তি বেশ কয়েকদিন মাথা কপাল ব্যান্ডেজ করে বিছানায় পড়েছিল। ব্লক হাসপাতালের ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গিয়েছে। ক'দিন নড়াচড়া করতে বারণ করেছে, পেটের বাচ্চাটা যাতে নষ্ট না হয়। নবীনের বুড়ো মা আর আন্নাই ঘরের কাজ, গরু ছাগলের কাজ সবই করেছে। লজ্জায় অপমানে শান্তি মুষড়ে গেছে। অনেকদিন সাক্ষরতা স্কুলে যায় নি। পরে ঐ স্কুলের দিদিরা এসে ডেকে নিয়ে গেছে।

নবীনের মনেও আপশোস হয়েছে, কেন আমি বৌ-এর গায়ে হাত তুললাম। পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল। পাঁচজন কত নিন্দে মন্দ করল। তবে নিজের পরিবারের গায়ে অমন একটু আধটু হাত তোলা নিয়ে এত কথাই-বা কিসের? পুরুষ মানুষ তো? নিজের ঘরে কে কি করল তা নিয়ে পাড়ার লোকের এত মাথা ব্যথা কিসের? নবীনের মনে মনে রাগও হয়।

কিন্তু কি করবে নবীন? দিন তো বদলে গেছে। বিশেষ করে ঐ পঞ্চায়েত হবার পর কারুই যেন আর রেহাই নেই। সাক্ষরতা স্কুলের দিদিরা নালিশ করেছে পঞ্চায়েতের কাছে। পঞ্চায়েত নবীনের বিচারের সালিশী বসিয়েছে। সেই মিটিং-এ আবার নবীনের শ্বশুর গোপালও এসে হাজির। সে তো তার মেয়ের দিকে টানবেই। খুবই মুস্কিলে পড়ল নবীন। আবার পঞ্চায়েত ডাকলে তো না গিয়েও উপায় নেই। মাঠে কাজ করে খেতে হবে তো? পঞ্চায়েতকে না মানলে কাজই বা পাবে কোথায়? এখন তো সব জায়গায়ই মানুষ জোট বেঁধে বেঁধে চলে। তাতে সুবিধাও আছে, আবার অসুবিধাও কম নাকি? ওরা ঘরের কথা নিয়ে বড় বাইরে টানাটানি করে। এই সেদিনও পাড়ার একটা বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরল, তো তার স্বামীর হলো হাজতবাস। লোকে বলল, ওর স্বামীই নাকি বৌটাকে মেরে গলায় কাপড়ের আচল বেঁধে উপরের কড়িকাঠের সংগে ঝুলিয়ে দিয়েছে। থানাও এখন মেয়েদের দিকটাই টানে। পঞ্চায়েত হবার পর থেকে ঘরের পুরুষদের আর আগের মতো স্বাধীনতা নেই। এখন আবার মেয়েরাও পঞ্চায়েতে আসছে।

অগত্যা নবীন পঞ্চায়েতের সামনে হাজির হলো। মিটিং-এর একপাশে মুখ চুন করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখল, ওধারে তার শ্বশুর গোপাল বসে আছে। হলই বা শ্বশুর। তবুও শান্তি তো তার মেয়ে। মেয়ের দিকটা টানবে নিশ্চয়ই। আর ঐ যে মলিনাদি? ওরে বাব্বা! উনি তো সব সময়ই মেয়েদের পক্ষে বলেন। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল না, শান্তি আসে নি। বাঁচা গেল। ওরা তো শান্তিকেও ডেকেছিল। দুজনের মুখ থেকে খোলাখুলি সব কথা শুনবে বলে। কিন্তু শান্তি নিজেই নবীনকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ঘরের কাজ আছে, মেয়েটার জ্বর, তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। ভালই হলো। পাশ থেকে মদন নবীনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, আরে মরদ, অত ভয় কিসের? খোলাখুলি সবকথা বলবি, না হয় একটু গালমন্দই শুনলি। তাই বলে বৌ তো আর পর হয়ে যাবে না, তোর বৌ তোরই থাকবে। নবীনের মেজাজ ঠিক নেই। এখন ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না। বলল, নে থাম, একটা বিড়ি দে।

নবীনের বিচার তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, নবীনের শ্বশুর গোপাল মেয়ে জামাই দু'দিকই সামলে দিয়েছে। নবীনের কোন কড়া শাস্তি হয়নি। ঠিক হয়েছে নবীনের এখন থেকে সন্ধেবেলায় ছেলেদের সাক্ষরতা স্কুলে যেতে হবে। লেখা-পড়া শিখতে হবে। সন্ধেবেলায় আর কোন তাড়িখানার আডড়ায় যেতে পারবে না। বই সেলেট ফ্রি দেওয়া হবে। ঘরে শান্তির কাছ থেকেও লেখাপড়া শিখতে হবে। কিন্তু মলিনাদি উসখুস করছেন। বলে উঠলেন, আর ঐ যে সবার সামনে শান্তির কাছে ক্ষমা চাইবার কথাটা হলো, তার কি হবে? গোপাল জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল: আরে সে ওরা নিজেরাই ঘরে ঘরে সেরে নেবে, সবার সামনে আর দরকার কি? মলিনাদি চুপ করে গেল। আর কথা এগোল না। অন্য আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তারপর মা মারা গেছে। আম্নার বিয়ে হয়ে গেছে। শান্তির মেয়ে হয়েছে। মা বাবা দু'জনেরই লেখাপড়ার মধ্যে জন্ম, তাই ওরা মেয়ের নাম রেখেছে বিদ্যা। বিদ্যা এখন আধো আধো কথা বলে, এক পা দু'পা হাটে। এ মেয়েকে ওরা ছোট থেকেই নিশ্চয়ই প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দেবে।

এখন আর শান্তির উপর রাগ হয় না নবীনের। নবীন বুঝতে পারে শান্তি তাকে কত ভালবাসে, কত যত্ন করে। এখন একলা ঘরে শান্তির খাটুনি অনেক বেড়ে গেছে। ঘরের কাজ, মেয়ের কাজ, গরু বাছুর আছে, মুড়ি ভাজা আছে। কল থেকে ধান ভানিয়ে নিয়ে আসা আছে। তার উপর আবার দুপুরে মেয়ে কোলে করে নবীনকে মাঠে গরম ভাত দিয়ে আসে।

নবীন লেখাপড়া শিখছে বলে শান্তির আনন্দের শেষ নেই। নবীন বানান ভুল করলে শান্তি ঠিক করে দেয়। এখন আর শান্তি সাক্ষরতা স্কুল গেলে নবীনের রাগ হয় না। এবার গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে মলিনাদিরা যখন শান্তিকে প্রার্থী দাঁড় করাল, নবীন তখনি রাজি হয়ে গেল। বরং সে খুশি হয়েছে। সে নিজেই পাড়ার ছেলেদের সংগে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে।

শান্তি খিল খিল করে হেসে উঠল। নবীন চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখে শান্তি তার দেওয়ালের লেখা পড়ছে। নবীন বলল: এই রে, তুই সব আগেই দেখে ফেললি? দেখ দেখ সব যুক্ত অক্ষয়গুলো ঠিক হয়েছে তো—শান্তিলতা মন্ডল...।

শান্তি বলল : বাব্বা ! হবে না আবার ? আমার চেয়ে তোমার লেখা তো অনেক ভাল।

ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেওয়ালের লেখাগুলো ভাল করে পড়তে লাগল।

নবীন বলল : তুই কত জানিস বৌ। তুই হলি গিয়ে এখন আমার গুরু, আমার চেয়ে কত বেশি জানিস তুই।

শান্তি থতমত খেয়ে বলল : পুরুষ মানুষের চেয়ে মেয়ে মানুষ বেশি জানে ? ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে ? কেউ মানবে না, লোক শুনলে কি বলবে ?

নবীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল : তা বলুক নে, লোকে কি জানে ? তারা কি আমার বৌ-এর সঙ্গে ঘর করেছে ? এমন বৌ—নবীন হাতের লণ্ঠনটা শান্তির মুখের উপর তুলে ধরল। শান্তি লজ্জা পেল। তার বিস্ময়ের সীমা নেই। নবীনের মধ্যে একটা নতুন মানুষকে যেন সে আবিষ্কার করেছে।

ওরা দু'জন পা চালিয়ে ঘরের দিকে চলল। মেয়েটা হয়তো এতক্ষণে জেগে উঠে কাঁদতে লেগেছে !

আমি সাজেদা বেগম

কি বললেন? না না, আমি কোন নবাব বাদশার বেগম নই। আমার নামই বেগম মাত্র। আমি ঐ ওধারের বীরপুর গ্রামের এক ক্ষেত মজুরের বৌ। মানে, বৌ ছিলাম। এখন আর নেই। এখন আমি এক গরিব দুঃখী খেটে খাওয়া মেয়ে। আমার তালাক হয়ে গেছে। না, শুধু মুখে মুখে তিন তালাক না। মৌলবী ডেকে লেখাপড়া করে তালাক দিয়ে গেছে সে আজ কত বছর হলো? তা বছর আট হবে বৈ কি? ঐ তো আমার বসিরের বয়েস তখন তিনবছর ছিল। এখন তো সে চার ক্লাসে পড়ে।

আমি এখন কোথায় থাকি? ঐ তো ওধারে আমার বাড়ি, আমার বাবার একখানা টালির ঘর আর এক চিলতে উঠোন। আমার বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রি। অনেক বছর আগে, আমার জন্মের আগেই মুর্শিদাবাদ থেকে এই গুসকরা শহরে এসেছিলেন রাজমিস্ত্রির কাজ নিয়ে। বাবাই ঘরখানা বানিয়েছিলেন।

আমার সংগে আর কে থাকে? কে আবার থাকবে? আমি আর আমার ছেলে থাকি। পাশের বাড়ির লক্ষ্মী মাসীরা আছেন। লক্ষ্মীমাসী আমার নিজের মাসীর মতই। ছোটবেলা থেকেই দেখছেন তো? ওর মেয়ের সংগে আমি বড় হয়েছি। একসংগে খেলেছি, স্কুলে গেছি। ওদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি নিজের মতই। আমার মায়ের সংগেও লক্ষ্মীমাসীর খুব ভাব ছিল। দুই বাড়ি ছেলে-মেয়েরা ঈদে, দুর্গাপুজোয় একসংগে খেয়েছি, ফুর্তি করেছি, এখনো ওনারাই খুব মায়া করেন আমাকে। এই তো আমি সারাদিন এখানে পড়ে আছি, আমার ছেলেটা স্কুল থেকে এসে ওদের বাড়িতেই থাকবে, খাবে। আমার কোন চিন্তা নাই।

বিয়ের কথা বলছেন? সেই কোন ছোটবেলায় বিয়ে দিয়েছিল বাবা। মা বাপের একমাত্র আদুরে মেয়ে ছিলাম আমি। ভাই-বোন কেউ ছিল না, বাবা আমাকে স্কুলেও দিয়েছিলেন। চার ক্লাসে উঠেছিলাম। মা হঠাৎ মারা গেল ক'দিনের জ্বরেই। বাবা তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলল। না, বেশি দূরে না। আমাদের এখান থেকে ক্রোশ কয়েক দূরে, বীরপুর গ্রামে। ক্ষেত মজুরের কাজ করত আমার স্বামী শেখ নুরুদ্দিন। ঘরে ছিল শাউড়ী আর চার

ননদ। তুই ননদের বে হয়ে গিয়েছিল। আর দুটো ছোট ছিল। ঘরের কাজ সবই আমি করতাম। শাউড়ীও কিছু কিছু করত। শাউড়ী মানুষটা খুব মন্দ ছিল না। জ্বালা যন্ত্রণা বিশেষ দিত না। তবে ঘরে অভাব। স্বামীর কাজ না থাকলে দুবেলা ভাত জোটানো কষ্ট হতো। তখন ঝগড়া-ঝাটি, মারধর লেগে যেত।

এর মধ্যেই আমার ছেলেটা হলো, বসির। বাবা আনতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ওরা আসতে দেয় নি। একবার কি নিয়ে যেন গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমার স্বামীর ঝামেলা বেধে গেল। আমাকে কিছু বলত না। বলবে কেন? মেয়ে মানুষকে তো ওরা মানুষ মনে করে না। মুরগীর ছানার মতো পোষা জীব মনে করে। ইচ্ছে হয় রাখ, কেটে খাও, কি বেচে দাও—যা ইচ্ছে কর। এক এক দিন ক্ষেতের কাজেও যেত না, সারাদিন বাড়িও থাকত না। কোথায় খেতো, কোথায় ঘুরত তাও কিছু বলত না। আবার রাত্তিরে নেশা করে ঘরে ঢুকত। শাউড়ী বলত ওরে কিছু বল না। যা করে করুক, মুখ বুজে সহ্য কর। না হলে কোথায় চলে যাবে, কটা পেট একেবারে শুকিয়ে মরব। কিন্তু আমি আর কত সহ্য করব। একদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে, মুখে ভুর ভুর করা মদের গন্ধ। আমার গা উল্টে এল। বললাম: নেশাখোরের সঙ্গে আমি শোব না। বদমেজাজি মানুষটা তখুনি এক লাথি দিয়ে আমাকে চৌকি থেকে ফেলে দিল। তখন আমার ছেলেটা পেটে। কাঁচা মাস। ভয়ে সিঁটকে গেলাম। বাচ্চাটা যদি নষ্ট হয়ে যায়। তাই দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকলাম। ছেলেটা ভালয় ভালয় হয়ে যাক।

হ্যাঁ, সেবার যে ঝামেলার কথাটা বলছিলাম। একদিন রাত্তিরে পুলিস এসে বাড়ির সব তছনছ করে খুঁজল। গোয়াল ঘরের পিছন থেকে কতগুলো খালি মদের বোতল বের করে নিয়ে গেল। আমার স্বামীকেও ধরে নিয়ে গেল।

কি? চোরা ব্যবসা? হ্যাঁ সেই সব কিছুই হবে। কিছু তো বলত না আমাকে। গাঁয়ে আমাদের মৌলবী সাহেব ছিলেন কংগ্রেসের নেতা। থানার সঙ্গে খুবই চেনাশুনা। পরদিনই তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বললেন: যা নুরু, কিছুদিন একটু দূরে গা ঢাকা দিয়ে সরে থাক। এদিকে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন আমার শ্বশুর বাড়ির সবাই মিলে এসে উঠলাম আমার বাবার কাছে, এই এখানেই। আমার বসির তখন তিনমাসের কোলে।

তারপর কিছুদিন বাবার ঘাড়ে বসে সবাই মিলে খেয়ে দেয়ে আবার ফিরে গেলাম গাঁয়ে। আবার কিছু কিছু ক্ষেতের কাজটাজ শুরু করল আমার স্বামী।

আপনাদের কিছু লাগবে? খাবার জল? আচ্ছা নিয়ে আসি। এই পাশেই টিউবওয়েল। না, এখানে আমি একলা নই। আরো মেয়েরা আছে। ঐ তো বাইরের বেঞ্চিতে আরো দু'জন মেয়ে বসে আছে—আমরা সবাই হলাম এই সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবিকা। এই তো দেখুন আমাদের ব্যাজে লেখা আছে। সমিতির ঐ যে মলিনাদি, ছবি মাসীমা, ওরাই তো আমাকে এই পথে নিয়ে এসেছেন। তা না হলে এতদিনে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে? হয়তো বা আত্মহত্যাই করে বসতাম। যাই জল নিয়ে আসি। কতদূর থেকে এসেছেন আপনারা, অনেক কষ্ট হয়েছে।

তারপর কিছুদিন কাটল স্বামীর ঘরে। ঐ পর্যন্তই। তার সংগে কোনদিন মিলমিশ আমার হয় নাই। হবে কি করে? তার মন মেজাজের কোন হদিসই পাইনি। সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকতাম। যেন দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে। পেটে ভাতে খেটে খাও। নয়তো ঝাঁটা লাথি খাও। আর পাঁচটা সংসারেও যেমন হয়ে থাকে। আইবুড়ো ননদ দুটোর বে হয়ে গেল। কিন্তু আবার বড় ননদের স্বামীটা মরে গেল। সে তার দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঢুকলো আমাদের সংসারে। বিঘে ৩/৪ জমি ছিল ওদের। সেই লোভে আমার স্বামীর একেবারে বোনের উপর দরদ উথলে পড়ত। বাবগা! মহা শয়তান বড় ননদটা। ভাইবোন একরকম। জ্বালিয়ে খেয়েছে, শাউড়ী কিন্তু নরম মানুষ ছিল। জ্বালা যন্ত্রণা দেয় নাই। কিন্তু সে ব্যামোতে পড়ল। হাত পা ফুলে মরে গেল। আমারও এরপর একটা মেয়ে হলো। তিনদিনের দিন মেয়েটা মরে গেল। ছেলেটার তখন তিন বছর।

এদিকে আমার বাবার খুব অসুখ হলো। আমার জ্যেঠতুত দিদি আমাকে আনতে গেল। কিন্তু ওরা আসতে দেবে না। ঘরের কাজ করবে কে? আমি জোর করে কাঁদতে কাঁদতে দিদির সংগে চলে এলাম। বাবার শেষ সময় দেখব না তা কি হয়? এসে দেখি বাবা একেবারে বিছানার সংগে লেগে গেছে। চোখের জল ফেলি আর বাবার সেবা করি। ওমা! ক'দিন পরেই দেখি আমার স্বামী এসে হাজির। বাবাকে বলল, বাড়িটা তার নামে লিখে দিতে হবে। বাবা বলল, লিখে পড়ে দেব না, আমি মরে গেলে তোমরাই পাবে। সেই হলো রাগ। আমাকে রেগেমেগে বলল: তালাক তালাক তালাক। শুধু মুখে বলে নাই, মৌলবী ডেকে এনে কাগজে লিখে তালাক দিয়ে চলে গেল।

কি বললেন, ঠেকালাম না কেন? কেমন করে ঠেকাব? আমার কি সে সাধ্য আছে? বাড়িটা বাবা লিখে দিলে হয়তো তখন ঠেকানো যেত। কিন্তু তারপর? তারপরও তো তালাক দিতে পারত? তখন আমি কোথায় যেতাম? বাবার

ঘরখানাতেও আশ্রয় পেতাম না। বাবার সম্পত্তি তো আমিই পেতাম। তবে ওর নিজের নামে লেখবার গরজ কি ছিল? তখনই বোঝা গেছে কুমতলব ছিল। ছিলই তো। নইলে মাস না ঘুরতে আর একটাকে নিকে করে নিয়ে এল কেন? সেখান থেকেও টাকা পয়সা পেয়েছিল শুনেছি।

এ সব কথা শুনতে আপনাদের ভাল লাগছে? কি? আপনাদের শহরেও এ-রকম হয়? তা হবেই তো। আমার মতো মেয়েরা তো সব জায়গায়ই আছে। তাদের কপালও তাদের সংগেই আছে। আপনাদের কাছে মন খুলে বলেও একটু শান্তি পাই। বুকে একটু বল পাই।

দিন কয়েক পর বাবা মারা গেল। বাবার সৎকারের সব ভার আমার উপর পড়ল। পাড়ার পাঁচ জনের সাহায্যে বাবার কবরে মাটি দিয়ে এলাম। বুকটা আমার খালি হয়ে গেল। আপন বলতে আর কেউ থাকল না আমার। তবু বাবার ঘরখানা ছিল বলে ছেলেটাকে নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলাম একটু। আমার জ্যেঠতুত দিদি মাকসুদা বিবি তবু দেখাশোনা করে এখনো। মাঝে মধ্যে সাহায্যও করে। ছেলেকে জামা প্যাণ্ট কিনে দেয়। খোঁজখবর রাখে। জামাই-বাবুর একটা ছোটখাট হোটেল আছে। ঐ ওধারে রেল লাইনের কাছে বাড়ি।

তারপর কি করে চলত? চলল আর কৈ? আমি পরের বাড়ির ঠিকে ঝি-এর কাজ করতাম। এক বাড়ির দু'বেলাই কাজ। এক বেলা মা-বেটা খাওয়া আর ২৫ টাকা মাইনে। আর একবাড়ি এক বেলা কাজ, ৫০ টাকা মাইনে। কিছুদিন পর আমার এক সম্পর্কের চাচা ওরগ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার। তিনি আমাকে জেলা পরিষদের একটা কাজ দিলেন। সুতো কাটার কাজ। লাচি প্রতি ৫৫ পয়সা। তা দিনে ২/৩ টাকা হতো। বাড়ি বসে কাজ করতাম। একটা ঠিকে কাজ ছেড়ে দিলাম। দিন-রাত খেটেও কি দু'টো পেট চালানো সহজ কথা? কিছু দিন পর এই শহরেই একটা রুটির কারখানায় রান্নার কাজ পেলাম। ছেলেটাও আমার হাতে হাতে টুকটাক করত। মা-বেটার খাওয়া দাওয়া ফ্রি, ১০০ টাকা মাইনে। তখন অনেকটা বেঁচে গেলাম। বেশ কিছু দিন চলল। তারপর কি সব গোলমাল হলো। রুটির কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার ঠিকে কাজ খুঁজতে থাকি।

সেই সময় মলিনাদি, ছবি মাসীমা ওরা আমাকে মহিলা সমিতিতে নিয়ে আসে। আমি এখন অনেক কথা বুঝতে পারি। ওরাই চেষ্টা করে আমাকে আই সি ডি এস-এর সহায়িকার কাজটা দিয়েছেন। পাঁচবছর হলো এই কাজ করছি। ছেলেকে স্কুলে দিয়েছি। চার ক্লাসে পড়ছে। এখানে ১১০ টাকা

মাইনে পাই। এ মাস থেকে ৯০ টাকা বাড়বে শুনছি। আবার সমিতির সেলাইয়ের স্কুলে দুপুরে মেশিন চালাই। সেখানেও কিছু পাই।

না, এখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। আপনাদের আশীর্বাদে আমার ছেলেটা মানুষ হোক। নিজের পায়ে দাঁড়াক। আপনারা সবাই-তো আমাকে ভালবাসেন। লড়াই করতে শিখিয়েছেন। আমি লড়াই করে যাব।

আবার কবে আসবেন আপনারা? তখন দেখবেন, সাজেদা আর এই সাজেদা নেই। অনেক কিছু শিখে গেছি, এখন তো আমি আবার বইটইও পড়ি। পড়াশুনা ভুলে গেছিলাম। আবার একটু একটু করছি। আমার মতো আরো কত মেয়ে যে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে .তার কি হিসেব আছে? আমি তো ভালই আছি পাঁচ জনের সংগে মিলে মিশে।

কি? সেই মানুষটার কথা? না না, সে মানুষটার জন্যি আমার মন পুড়বে কেন? তার কথা ভাবলেই তো আমার ভয় হয়। তবে মনে হয়, আরো যে তিন-তিনটে মেয়ের সর্বনাশ করেছে, সে অভাগীরা কি করছে? কোথায় আছে? এখন যে মেয়েটা তার ঘর করছে, সেই বা কি করে সহ্য করছে? মেয়েগুলো কেমন করে জুটলো? আমাদের সমাজে অমন কত হয়, এক একবার অভাবে পড়ে, আর একটা করে তালাক দিয়ে আর একটাকে নিয়ে আসে। বিয়ে-শাদিও টাকা রোজগারের পথ। মেয়েমানুষ যেন ওদের হাতের পুতুল। মাঝে মাঝে মনে হয়, আরো যে মেয়েগুলোকে তালাক দিয়েছে তাদের যদি পেতাম, তবে সবাই মিলে দল বেঁধে এর একটা বিহিত করে আসতে পারতাম। গা জ্বলে যায়, এত অন্যায় অত্যাচার আর কতদিন মুখ বুজে সহ্য করব আমরা? কিন্তু কি বিহিত করব? আমাদের সমাজ যে ঐ রকম। আইনকানুনও ঐ রকম। আপনারাই বলুন আমাদের, কোন পথে যাব? কিভাবে এর বিহিত করব? কেমন করে, কোন দিক থেকে ধাক্কা দিলে আমাদের সমাজের শয়তানের বাসাগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে বলুন তো?

না না, আমি রাগারাগি করি না। আগে তো মুখ বুজে সবই সহ্য করেছি। এখন সব দেখেশুনে ঘেন্না হয়, রাগ হয়। পরে আবার হাসিও পায় অনেক দুঃখে। সবারই তো দুঃখ আছে। আমার তো একার নয়।

কি? বিয়ে? আবার বিয়ে? না না, ওদিকে আমি যাই নি। বয়েস? বয়স আমার তিরিশ বছর। কি? আমার চেহারা সুন্দর? এখন আর চেহারা কৈ? ছোটবেলায় তো সবাই আমাকে সুন্দরী বলত। এখন আমি পোড়ামুখী হয়ে গেছি। হাসি পায়। আপনারা ভালবাসেন, তাই ভাল চোখে দেখেন।

আমি আর বিয়ে করার কথা ভাবি না। তবে আমাদের সমাজে চল আছে। ছেলেশুদ্ধও নিকে করতে চেয়েছিল এক ভাল ঘরের ছেলে। আমার চাচার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আমি আর ও পথে যাব না। মুখে সবাই বলবে ছেলেকেও রাখবে, যত্ন করবে। কিন্তু আমি জানি তা করবে না, পরে আমাকে রাখবে, কিন্তু আমার ছেলেটাকে ভালবাসবে না। পরের বারের স্বামী আগের পক্ষের ছেলেকে সহ্য করবে না। আহা, বসির যে আমার বুকে লেপটে আছে। ওর জন্যই বেঁচে আছি, বসির আমার বেঁচে থাক। আমি আর কিছু চাই না।

কিন্তু কি ভাবি জানেন? আমি তো লড়াই করে করে চলেছি দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে। কারও যেন আমার মতো এমন বরাত না হয় এটাই চাই। তবে তা তো হয় না। ঘরে ঘরে আমার মতো সাজেদা পড়ে আছে। কি হবে বলুন তো? আর কত দিন ধৈর্য ধরে থাকব? কেমন করে এর বিহিত হবে?

ওঃ রাত অনেক হয়ে গেল। আপনারা শুয়ে পড়ুন। সকালে উঠে তো আবার আটটা থেকে সম্মেলন শুরু হবে। আপনাদের একটু বিশ্রাম হলো না। আমিও বাড়ি যাব। এতক্ষণে ছেলেটা হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। এই তো এই কাছেই বাড়ি। যেতে যেতে রোজই ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার চোখে ঘুম আসে না। বুক দুর দুর করে। মুখে ওর বাপের আদল আসে। ভয় করে। ও বড় হয়ে ভাল হবে তো? না বাপের মতো হবে? আর কিসের ভয় আমার জানেন? যদি ওর বাপ হঠাৎ এসে ছেলেটাকে নিয়ে যায়! ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আর একটু বড় হলেই তো ওকে দিয়ে ক্ষেতের কাজ করাতে পারবে। যদি জোর করে?

আইন? আমাদের আইন তো ছেলের মুখে। ছেলে যদি মুখ দিয়ে বলে যে হ্যাঁ, আমি বাপের কাছেই যাব। তবে তো আমি ঠেকাতে পারব না। যদি ওরা চক্রান্ত করে ছেলেকে ঐ রকম শিখিয়ে দেয় কেউকে দিয়ে? যদি গোপনে পথে-ঘাটে ছেলের সঙ্গে দেখা করে কুমন্ত্র দেয়? তখন? তখন আমাদের আইনকানুন সমাজ কেউই তো আমার দিকে টানবে না। তাহলে কি করব? আমার বসিরকে নিয়ে গেলে আমি আর বাঁচব না দিদি, আমি আর বাঁচব না।

না না, ভেঙে পড়ব কেন? আমি ঠিক আছি। কিন্তু কিভাবে এইসব অন্যায় আইনকানুনগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা যায়? পথ বাতলে দিন একটা, আমরা তো লড়াই করতেই চাই। লড়াই করে খেটে খেয়ে বাঁচতে চাই। আমি তো নিজেই খেটে খাই। কারও কোন ক্ষতি তো করি নাই। তবুও এই

সমাজে শয়তানের ভূত আমাদের তাড়া করে বেড়ায় কেন বলতে পারেন? শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করছি। কবে এর বিহিত হবে? কবে ফিরবে আমাদের কপাল?

না না, আমি ভেঙে পড়ছি না। আমি ঠিক আছি। আপনাদের পাঁচজনের সঙ্গেই তো আছি। রাত হয়ে গেল। বাড়ি যাই, আপনারাও ঘুমান। আবার আসব কাল সকালে। আপনাদের কাছে মন খুলে কথা বলে মনে একটু শান্তি পাই। ভরসা পাই। আচ্ছা, যাই এবার।

খুনী

তারা নেই একটিও আকাশে। অন্ধকার নেমে এসেছে এলোমেলো বনাঞ্চল ঘিরে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। দক্ষিণের সাগর থেকে বেরিয়ে আসা একফালি মরা নদীর পাড় ঘেঁসে ছোট্ট পুবালী গ্রাম। ঘুমন্ত গ্রামখানা হঠাৎ একটা ভয়ংকর আর্ত চিৎকারে ধড়মড় করে উঠল। কে কোন দিকে ছুটছে তার ঠিক নেই। অন্ধকারের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের শিখা। দাউদাউ করে জ্বলছে হালদার পাড়ার ঘরবাড়ি, গোয়াল ঘর, ধানের মরাই। গোয়ালে বাঁধা গরু-বাছুরগুলোর হাম্বা হাম্বা চিৎকার শুনছে না কেউ। আতঙ্কে দিশেহারা মানুষ যে যেদিকে পারে ছুটছে। শক্তি হালদারদের বাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আশে-পাশের চালাঘরগুলোর লেলিহান আগুন ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার বনবাদাড়ে। চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটছে। ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছে রাত্রির আকাশ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের অসহায় আর্তনাদ উঠছে, বাঁচাও! বাঁচাও! লাঠি, সড়কী, বাঁশ যে যা পারে হাতে নিয়ে যোয়ান ছেলেরা নেমে পড়েছে আত্মরক্ষার লড়াইয়ে। ওদিকে পৈশাচিক উল্লাসে বিকৃত গলাগুলোর গর্জন উঠেছে—বন্দে মাতরম্ !

এই হঠাৎ আক্রমণ কিন্তু ঠিক হঠাৎই আসেনি। বোমা, পিস্তল নিয়ে ওরা যেন তৈরিই ছিল। নইলে এত বোমা আর এত অস্ত্রশস্ত্র কি আর হঠাৎই পাওয়া যায়? কিন্তু কি জন্যে এই আক্রমণ? কিসের এত আক্রোশ? এত বিবাদ কিসের? কারা ওরা? কি চায় ওরা? কি অপরাধ এই ছোট্ট শান্ত সবুজ গ্রামখানার?

ধর ধর ঐ যে পালালো পালের গোদা শক্তি, ঐ তো স্বপন, জয়নাল, শিবু—পালিয়ে যাচ্ছে দল বেঁধে। কোথায় যাবে বাছাধনরা? ছোট্-ছোট্-অভয়-শম্ভু মদন—এই মদন তোর হাতেই কিন্তু সব—মনে থাকে যেন—কথা দিয়েছিলি ঐ পালের গোদা—শক্তিটাকে কিন্তু •একেবারে—বন্দে-মা-ত-রম্…। নিপাত যাক—লাল ঝাণ্ডা, নিপাত যাক—নিপাত যাক কাস্তে-হাতুড়ি-তারা !

কাঠ হয়ে বসে রইল পার্বতী। কোলের মেয়েটা ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। সব কথাই শুনতে পেল সে। ভয়ে শিউরে উঠে চেঁচিয়ে বলল—না-না গো-যেওনি

যেওনি—ওকাজ করনি। কিন্তু মদন তার কথায় কর্ণপাত না করে দুমদুম করে দাওয়া থেকে কুড়োলটা হাতে তুলে নিয়ে দলবলের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল। পার্বতীর কানে তখনো বাজছে ওদের কথাগুলো—মদনা, হেই মদনা বেরিয়ে আয় শীগগীর। বেরিয়ে আয়। সর্বনাশ হয়ে গেছে—নেতা খুন হয়ে গেছে আমাদের—তারে বেতারে খবর ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিকে—এইবার মৌকা মিলেছে আমাদের। গুরুর আদেশ হয়েছে এই মৌকা ছেড় না—এবার মুখের মতো জবাব দাও ওদের—দখল কর—দখল করে নাও আবার আমাদের তেরঙ্গী ঝাণ্ডার গ্রাম। কতবড় আস্পদ্দা! ঐ শয়তানগুলো এখানে কিনা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছে! ভোটের বাকস্ একেবারে উলটে দিয়েছে। এবারে বুঝুন তার মজা! আর ঐ যে শক্তি ছোঁড়াটা এতদিন 'হাতের' সেবা করে এসে এখন কিনা উনি 'কেস্তে-হাতুড়ি' হয়েছেন—হ্যাঁ! শেষ কর ওটাকে—দে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে রক্তবীজের ঝাড়বংশ—।

মদন সর্দারের পাকা হাত, পাকা মাথা। সময় বুঝে বলল, নারে শম্ভু না অভয়দা, আমি আর পারবনি। তোমরা সব আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করাও, আর আমাকেই তো ঠকাও।

অভয়ের গলায় উল্লাস—আরে না, না। এবার আর সে ভাবনা নেই। এই দ্যাখ, আগাম আমি নিয়েই বসেছি। গুরু বলেছে, টাকা আসছে অঢেল। কত লাগবে তোদের? জানিস না, ঐ আমাদের নতুন সাঁকরেদরা টাকার কুমীর—ঐ যে, ঐ 'পদ্মফুল' গো। শম্ভু ছড়া বেঁধেছে—'হাতে আছে পদ্মফুল/কড়ি গুনতে হবে না ভুল—হেঁ হেঁ চল্ চল্'।

পার্বতী আঁতকে উঠল। পাড়ার ছেলে শম্ভু শিবু জয়নাল। এই পথ দিয়ে কতবার আসা যাওয়া করে। শক্তির কোমল মুখখানা ভেসে উঠল পার্বতীর চোখের সামনে। সুবলের সঙ্গে কতবার এ বাড়িতে এসেছে। পার্বতীর ছেলে সুবল তো শক্তি-দের স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ত। বছর তিনেক হলো তার বাপের বাড়ির গাঁয়ে গিয়ে হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মদন বলেছিল, আর পড়ে কি হবে? চাষের কাজ করুক। পার্বতীর ভাই বলল, নারে পার্বতী, তোর ছেলেটার যখন মাথা আছে, এখন আমাদের গাঁয়ের হাই স্কুলে পড়ুক। স্কুলটা নাম করা। ফি বছর কত ছেলে পাশ করে বেরয়। আমার ছেলেটার সঙ্গে স্কুলে যাবে, আবার হাতে হাতে চাষ বাসও শিখবে। এই তো কোশ দুই দূরে বেন্দা গ্রাম। হাঁটা পথ। আসবে যাবে। ছেলেটাও গোঁ ধরল। তাই পাঠাতেই হলো। প্রায়ই তো আসে। তবু খালি খালি লাগে পার্বতীর। কিন্তু আজ পার্বতী

ভাবল, ভালই হয়েছে, সুবল এখানে নেই। চারিদিকে যা গোলমাল, সুবলের যেন কোন অমংগল না হয়। কিন্তু শক্তি ছেলেটা তো বড় ভাল। ওর মা-বাবাকেও তারা জানে। ছেলেটা সেদিনও এপথ দিয়ে যাবার পথে জল চেয়ে খেয়ে গেল। বলল, জানেন মাসীমা, আমি এবার স্কুল পাশ দিয়ে কলেজে পড়তে যাব। কিছুদিন হলো ওদের সংগে মদনদের দলের বনিবনা নেই। কিন্তু তাই বলে —।

পার্বতী হাট করে খোলা দরজাটার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ংকর শব্দে গুলি গোলা বোমা ফাটতে থাকল। ঘরের মধ্যে মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। পার্বতী তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে দরজার খিল তুলে দিল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে রইল মেয়েটাকে কোলে নিয়ে। বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে শিশুর মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল। কার মুখের আদল? এত কচি মুখে কিছুই বোঝা যায় না। চোখের সামনে ভেসে উঠল সুবলের মুখখানা। হ্যাঁ, সুবলের মুখে তো স্পষ্টই মদনের মুখের আদল। সবাই তো তাই বলে। শিউরে উঠল পার্বতী—সুবল—সুবল—বাপ আমার—খুনীর ছেলে খুনী হোস না বাপ! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পার্বতী। কি করবে সে? কোথায় যাবে? কি করে রক্ষা করবে তার সুবলকে আর এই দুধের শিশুটাকে?

ওদিকে প্রচণ্ড বোমার শব্দ, চিৎকার, আর্তনাদ। কী ভয়ংকর শব্দ—আগুন লেগেছে বোধহয় কাছেই কোথাও। কী করবে এখন পার্বতী?

সে কাল রাত্রি ভোর হয়েছে। পুবালি গ্রামখানা পড়ে আছে শ্রীহীন, বিধ্বস্ত, রণক্লান্ত। গ্রাম সমিতি, পঞ্চায়েত, পুলিস বাহিনী কেউই এখনো ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে উঠতে পারেনি। শক্তি হালদারের ধড়-মুণ্ড আলাদা আলাদা ভাবে পাওয়া গেছে নদীর ওপারের জংগলের মধ্যে। স্বপন আর জয়নালকে অচৈতন্য ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় থানার পাশের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তেমনি আরো বাইশ জন নারী-পুরুষকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। কেউবা ছিল পাড়ার মধ্যে, কেউবা নদীর ধারে থানার দিকে ছুটে যাবার পথে, কেউবা আশপাশের বনে জংগলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল।

শক্তি স্বপন জয়নালদের দলটা হঠাৎ আক্রমণের মুখে ছুটছিল থানার দিকে আশ্রয় নিতে। শীর্ণ, মরা নদীটার ওপারেই থানা। হাঁটু জল পেরিয়ে ওপারে যেতেই পিছন থেকে বোমার টুকরো গায়ে এসে পড়ল ওদের। এদিক ওদিক ঝোপ জংগলের দিকে ছুটে গেল ওরা। সেখানেই বাধল খণ্ডযুদ্ধ। শক্তিরা তিনজন কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল দল থেকে। ওদের বড়ো দলটা

তখনো অনেকটা পিছিয়ে। থানার দিকেই আসছিল বড়ো দলটা। কে যে কোন দিকে গেল তার ঠিক নেই।

শক্তিকে যখন ওরা অভিমন্যুর ব্যূহের মতো ঘিরে ধরে গায়ে মাথায় ডাণ্ডা মারছে, সে তার সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। শক্তি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল, সবাই চেনা মুখ। শেষ আর্তনাদ করে উঠল উদ্ধত কুড়োল হাতে মদনের দিকে তাকিয়ে—'মদনকা তুমি! মেরোনা মেরোনা মদনকা'! মদন অট্টহাসি করে উঠল: ব্যাটা 'হাত' ছেড়ে 'কেস্তে হাতুড়ি' হয়েছিস মর মর! মদনের কুড়োলের ঘায়ে শক্তির লুটিয়ে পড়া দেহ থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে ছিটকে গেল।

স্বপন আর জয়নাল তখনো গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। তাদেরও শেষ করার জন্য যখন জাপটে ধরল মদনদের দল, ঠিক তখনই হৈ হৈ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শক্তিদের পিছিয়ে পড়া বড়ো দলটা। বড়ো রাস্তায় পুলিসের গাড়ির হর্ন শোনা গেল। দুড়দাড় ছুটে পালালো হামলাবাজরা। কিন্তু তাদের মধ্যে মদন, হামিদ আর শম্ভু ধরা পড়ে পুলিসের গাড়িতে চালান গেল সদরের হাজতে।

সকালের রোদ্দুরে সেই বনাঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে, থমথমে নির্বাক। ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ভোরের তাজা সবুজে। গাঁয়ের মধ্যে শোকের ছায়া। মুখে যেন কথা নেই কারও। হালদার পাড়ার বাড়িগুলো প্রায় সবই পুড়ে গেছে। খড়ের চালাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পাকাবাড়িগুলোর দরজা জানালায় আধপোড়া চিহ্ন। শক্তি হালদারের গোয়ালটাও পুড়ে গেছে। মরে পড়ে আছে দু'টো গোরু, একটা বাছুর। খুঁটিতেই বাঁধা ছিল, খুলে দেয়নি কেউ, তাই ছুটে পালাতে পারেনি। খানিক দূরে একটা পোড়ো বাড়ির দাওয়ায় পড়ে আছে একটা শিশুর মৃতদেহ বুকে জড়ানো এক নারীর উলঙ্গ মৃত দেহ। কে এই নারী? হিন্দু না মুসলমান? কোন্ দলেরই বা? শিশুটি কি পুত্র না কন্যা? কেউ আর এসব জিজ্ঞেস করছে না। শ্মশানের হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে বর্ধিষ্ণু গ্রামখানার বুকে।

শক্তি হালদারের বাড়ির উঠোনে লোকে লোকারণ্য। শক্তির বাবা শরৎ হালদারকে ঘিরে রয়েছে আত্মীয়-স্বজন, শক্তির স্কুলের মাস্টারমশাইরা। শক্তির খণ্ডিত দেহটা জোড়াতালি দিয়ে নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল উঠোনের মাঝখানে। ঢাকা হয়েছে লাল পতাকায়। শক্তির মা সেই নিষ্প্রাণ দেহটার উপর আছড়ে পড়েছে বুকফাটা কান্নায়। পাড়ার মেয়েরা ঘিরে রয়েছে তাকে। অদূরে সামনের

কাঁচা রাস্তার মোড়ে পতাকায়, ফুলে, মালায় সাজানো ম্যাটাডোর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে শক্তির শেষ যাত্রার অপেক্ষায়। পায়ে পায়ে মানুষের ভিড় বেড়ে চলেছে শোক মিছিলে পা মেলাতে।

ধরা পড়েছিল মদন হামিদ শম্ভু, আরো তেরো জন। আরো সাত জনের নামে আছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। কিন্তু তারা গা ঢাকা দিয়ে ফেরার হয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের পান্ডা সুধাকর বাবু আগাম জামিন নিয়ে গ্রেপ্তার এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। বুক ফুলিয়ে বলছেন—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে—আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেই এ সব খুনের অপবাদ দেওয়া হয়েছে, মামলা টিকবে না—দেখে নেব আমরা। গ্রামে ঢোকার মুখেই পুলিস ক্যাম্প বসেছে, খানা তল্লাসি চলছেই। আদালতে মামলা উঠেছে। সংবাদ বেরোচ্ছে খবরের কাগজে।

কদিন পরেই মদনরা ক'জন জামিনে খালাস পেয়ে গেল। সুধাকর বাবুদের টাকার অভাব নেই। বড় উকিল লাগিয়ে জামিন আদায় করেছেন খুনের আসামীদের।

জামিনে খালাস পেয়ে মদন গাঁয়ের দিকে হাঁটতে থাকল। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লম্বা লম্বা মাথার চুল রুক্ষ। পরনের লুঙ্গি, শার্ট ময়লা। বাড়ি গিয়ে নেয়ে ধুয়ে আবার মানুষের মতো হবে। যে হাজার টাকা আগাম নিয়েছিল, তার আটশো টাকা এখনো ট্যাঁকে আছে। বাকি দু'শ টাকা হাজতের বাবুদের দিতে হয়েছিল টাকাটা ট্যাঁকে রাখার জন্য। এখনো পাওনা বাকি টাকাটা আদায় করতে হবে সুধাকর বাবুদের কাছ থেকে।

আর একটা বাঁক পেরোলেই পুবালি গ্রাম। মদন জোরে জোরে পা চালায়। বড়ো রাস্তার মুখেই হঠাৎ দেখা শম্ভুর ভাই গণেশের সঙ্গে। ভ্যান ভর্তি তরিতরকারী নিয়ে আসছিল এদিকের হাটে বেচতে। ভ্যান থামিয়ে দাঁড়াল গণেশ। মদনদা না? হ্যাঁ, তাই বটে। তা আমার দাদা কই?

—আসবে, আসবে সবাই।

—গাঁয়ে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ রে।

—তা এখন গাঁয়ে তুমি না গেলেই ভালো করতে।

—কেন?

গণেশ বলে চলল: এখন গাঁয়ে অন্য রকম। আমরাই ভয়ে ভয়ে আছি। গণেশের কাছে সব খবর শুনল মদন। গ্রামে এখন লাল ঝাণ্ডার রাজত্ব। ছেলে-

বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাই মিটিং মিছিল করছে। আজও তিন রাস্তার মোড়ে ঐ ওদের সভা বসেছে। তিন গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়েছে। কলকাতা থেকে ব্যাটা-ছেলে, মেয়েছেলে নেতারা এয়েছে। স্কুল কলেজের ছেলেরা মিছিল করে আসছে। গাঁয়ের বৌ-ঝিরাও এসে জড়ো হয়েছে, আবার মহিলা সমিতির মেয়েরা ঐ শক্তি হালদারের মা-টাকেও এনে বসিয়েছে মঞ্চের উপর চেয়ারে। মিছিলের পর মিছিল আসছে আর আওয়াজ উঠছে : শক্তি হালদারের খুনীদের শাস্তি চাই। সে পথ দিয়ে মদনের এখন না যাওয়াই ভালো।

গণেশের কাছ থেকে মদন আরো শুনল, গাঁয়ে এখন সুধাকর বাবুদের আখড়ায় পুলিস তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সেখানে নাকি খানা তল্লাসি করে বোমা টোমা কী কী সব পাওয়া গিয়েছিল। আর মদনদের বাড়ি? চারিদিকে যা উৎপাত, কচি বাচ্চাটাকে নিয়ে পার্বতী একা থাকে কী করে? পার্বতীর ভাই এসে তাকে নিয়ে গেছে তাদের বেন্দা গ্রামে। মদনদের বাড়ির মুনিষটা আছে। গোরু-বাছুর দেখাশোনা করে। ঐ আবার একটা মিছিল আসছে এদিকে। গণেশের হাটের বেলা বয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ভ্যান চালিয়ে চলে গেল।

মদন তাহলে এখন কী করবে? কোথায় যাবে? ভাবতে আর সময় পেল না সে। দূরের মিছিলটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে। মদন একটু পাশ কাটিয়ে পথের ধার ঘেঁসে দাঁড়াল। ঘন ঘন আওয়াজ : শক্তি হালদারের খুনীদের শাস্তি চাই—শাস্তি চাই। স্কুল কলেজের ছেলেদের মিছিল। হঠাৎ চমকে উঠল মদন—একি? কে ও? ঐ যে ছেলেরা হাতে হাতে পতাকা নিয়ে বজ্রমুষ্টি তুলে স্লোগান দিতে দিতে আসছে : শক্তি হালদারের খুনীদের শাস্তি চাই। ওদের মধ্যে ঐ তো রয়েছে সুবল—সুবল-না? নিজের সন্তানকে মদনের চিনতে ভুল হবে কেমন করে? কী সর্বোনাশ! সুবল কি এদিকে তাকিয়ে ছিল? মদনকে চিনতে পারেনি তো? কী হবে এখন? কী করবে মদন? মদন তাড়াতাড়ি পিছনের ঝোপের মধ্যে এগিয়ে গেল। একটা বড়ো গাছের গুড়ির নিচে ধপাস করে বসে পড়ল সে। দু'হাতে গাছের গুড়িটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল মদন। তখনো তার কানে ভেসে আসছে মিছিলের আওয়াজ : শাস্তি চাই-শাস্তি চাই। শক্তি হালদারের খুনীদের শাস্তি চাই!

আমরা ভালোই আছি

শি—শি—বোতল... ব—ই—খাতা—গামলা—বালতি—ভাঙা...পু—রা—নো—টিন—কৌ—টা—কাঁ—চ—ভা—ঙা...

ও মাসি, আছে নাকি কিছু?

চমকে উঠি। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। আরে, এ যে সেই কিশোর কণ্ঠের চেনা ডাক। কে, রতন না? তাড়াতাড়ি জানালার কপাট দুটো খুলে দেই। ওপাশে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঝোলা কাঁধে এই তো সেই রতন। সেই চেনা মুখ। সেই ম্লান হাসি। কিন্তু চেহারাটা অনেক কাহিল হয়ে গেছে। মাথাটা নেড়া। বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: কি মাসি দেবে না কিছু?

আরে, তুই রতন না? এত দিন কোথায় ছিলি? অনেক দিন যে আসিস না? দেশে গিয়েছিলি? অসুখ করেছিল? মাথা নেড়া কেন? আয়, ওধারের দরজার কাছে আয়।

রতন কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে কয়েকটা খালি কৌটা শিশিগুলি নিতে নিতে বলে চলল, দেশে-টেশে যাইনি মাসি, আমাদের বড় বিপদ গেল। বাবা মরে গেল। ঐ যে পুরনো কাগজের দোকানে কাজ করত। সেই ছেঁড়া-খোঁড়া পুরনো বই, খাতা, কাগজের মধ্যেই হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে মরে গেল। সবাই ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বলল, ও তো মরেই গেছে আর চিকিচ্ছা কি করব। মা কাঁদল। আমরা সবাই কাঁদলাম। কিন্তু কি আর করব? বাপের ছেরাদ্দ তো করতে হবে। চেনাজানা মানুষজন মাকে কিছু কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে গেল। কাজ হয়ে গেল। আমরা মাথা নেড়া করলাম। পাঁচজন বামুনকে খাওয়ানো হয়েছিল।...শিশি কটা এমনি দিলে তো? দাম নেবে না?

রতন তার বাবার মৃত্যু সংবাদ এবং পরিবারের বিপর্যয়ের কথাগুলি এমনি অনায়াসে, অতি সহজ গলায় বলে চলেছিল।

—তোদের তাহলে চলে কী করে? রোজগার করে কে?

—কে আর করবে। আমি সারাদিন এই শিশি, বোতল কাগজ কুড়িয়ে বাবা যে দোকানে কাজ করত সেখানেই বিক্রি করে দিয়ে আসি। তিনটে পাড়ায় ঘুরি,

এ পাড়ায় দু-দিন, ওপাড়ায় দু-দিন এমনি করে। দোকানের মালিক বেশ ভালো মানুষ। বাবার বন্ধু ছিল তো? আমাকে একটুও ঠকায় না। তবে অন্য অনেক ছেলেদের ঠকায়, ওজনেও ঠকায়। দামের হিসাবেও ঠকায়। মা তো এখন আর ঘরে বসে থাকে না। শিয়ালদা থেকে আনাজ এনে আমাদের পাড়ার ফুটে বসে বিক্রি করে। এতেই আমাদের চলে যায়।

—আর তোর ভাইবোন—কি যেন নাম তাদের?

—ভাইয়ের নাম জিতেন আর বোনের নাম শিবা। ওরা দুজনেই কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ে। তবে রোজ ভোরে ওঠে ওরা দু'জনেই পাড়ার মধ্যে কাগজ কুড়োয়। তাতেও কিছু হয়। ওরে বাবা, ওরা কিছুতেই পড়া ছাড়বে না। আমার ভাইটার খুব মাথা ভালো, এই বার ফোরে উঠল। ও বলে আমি একটা পাশ দেবই। আমার মাথা ভালো না। আমি তিন কেলাসের পরেই পড়া ছেড়ে দিয়ে বাবার সংগে সংগে এই কাজ করছি। আর বোন টু-তে পড়ে। ঐ তো পার্কের ওধারেই ওদের স্কুল। দিদিমনিরা ওকে খুব ভালোবাসে। আমার বোন স্কুলে নাচ গান করে। ওদের স্কুলের দিদিমনি বলেছে কর্পোরেশনের স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কোন দেশে যেন ওরা বেড়াতে যাবে। ওদের এরোপ্লেনে চড়াবে। এ বছর না সামনের বছর। তাই গান-নাচ কত কী শেখাচ্ছে। মা বলে পড়ুক পড়ুক। আমার দিদিরও খুব লেখা-পড়ার শখ ছিল। কিন্তু পারেনি। তাই মা দুঃখ করে।

—তোর দিদি? তার কথা তো বলিসনি।

—হ্যাঁ, দিদি ছিল। তার নাম ছিল তারা। সেবার রেলে কাটা পড়ে মরে গেল। রোজ ভোরে বস্তির মেয়েদের সংগে রেল লাইনের ধারে কয়লা কুড়োতে যেত। ঐ দুই নম্বর বিরিজের ধারে। মা সেই কয়লা দিয়ে উনোন ধরাতো আর আশেপাশে বিক্রিও করতো। কয়লার ঝুড়ি নিয়ে লাইন পার হতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ে গেল। সেই থেকে মার কত দুঃখু। তবে দিল্লির সরকার দিদির জন্য বাবাকে নগদ পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। বাবা কেঁদে কেঁদে বলতো মেয়েটা মরে গিয়েও সংসারের জন্য রোজগার করে গেল। আমার দিদি খুব সুন্দর ছিল। আমার জেঠা একবার দেশ থেকে এসেছিল। বলেছিল, দিদিকে দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবে। টাকা পয়সা সব দেবে। তা আর হলো না। তাই তো মা দুঃখু করে।

—কি বললি? দেশ কোথায় তোদের?

—ঐ সেই বিহারের মজফ্‌ফরপুরে। না, আমরা কোন দিন দেশে যাইনি।

আমাদের দেশ এই কলকাতাতেই। রেললাইন পেরিয়ে ওধারের বস্তিতেই আমরা থাকি। আমাদের দেশের আরও অনেক লোক আছে ওখানে। সবাই আমাদের মতো বাঙালী হয়ে গেছে। যাই মাসি, আর কিছু নাই তো? দুধের প্যাকেটগুলো কি কর? ফেলে দাও? না না ফেলে দিও না, ওগুলো জমিয়ে রেখ আমি সামনের মাসে এসে নিয়ে যাব। যাই তবে...

শি—শি—বো—ত—ল... কাঁ—চ ভা—ঙা··· ব—ই—খা—তা...

রতনকে আর দেখা গেল না। তার গলার স্বর ভেসে আসতে লাগলো। কান পেতে রইলাম। যতক্ষণ সেই সুরের আভাস পাওয়া যায়।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। খুট খুট দরজায় শব্দ। দরজা খুলতেই দেখি কাঁধের ঝোলাটা নিচে নামিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে রতন।

ইস, একেবারে ভিজে গেছিস যে। কোত্থেকে এলি এই বৃষ্টির মধ্যে?

সকালে বেরিয়ে ছিলাম মাসি। তখন বৃষ্টি ছিল না। এখন বৃষ্টি পড়ছে, আর ঘুরতে পারছি না। তাই তোমাদের ছাতের নিচে দাঁড়িয়ে আছি, বৃষ্টি থামলে যাব। শিশি বোতল কিছু আছে নাকি?

রতন কোমরে হাত দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃষ্টি ধোয়া আবছা দিনের আলো এসে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে তার চোখেমুখে। ডাগর চোখ দু'টোয় কৌতূহলী দৃষ্টি। রোগা অ-পুষ্ট চেহারা। কিন্তু কি এক লাবণ্য যেন ছড়ানো তার মুখে। কৈশোর পেরিয়ে আসা বয়ঃসন্ধিক্ষণের চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠেছে তার দেহে।

আকাশে তখন মেঘ। বৃষ্টি থামেনি। রতন বলে গেল অনেক কথাই। তেমনি তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ গলায়।

—মা তো এখন আর আনাজ নিয়ে ফুটে বসে না। বাড়িতে ঠোঙা তৈরি করে। আমি কাগজ যোগাড় করে দিই। ভাই-বোনেরাও রাতে হাতে হাতে মায়ের সঙ্গে কাজ করে। আমার ভাই দোকানে দোকানে দিয়ে আসে।

মা আর আনাজ বেচে না কেন? পুলিসের জন্য। সেদিন পুলিস এসে ফুটের দোকানগুলো তছনছ করে দিল। বেধড়ক লাঠির বাড়ি মারল সবাইকে। আমার মায়ের ডান হাতে চোট লাগল। এখনও ব্যথা আছে। সমস্ত আনাজপাতি পোটলা করে লরিতে তুলে নিয়ে গেল পুলিস। বলল, ফুটে দোকান করা বেআইনী। ৫০ টাকা ফাইন দিতে হবে। মার কাছে আনাজ বিক্রির দাম ৩২ টাকা ছিল। সব কেড়ে নিল। বলে গেল কাল ১০০ টাকা দিবি। তবে আনাজ ফিরে

পাবি। আবার ফুটে বসতে পারবি। আমার মা অত টাকা কোথায় পাবে? অই আর যায়নি। ঘরে বসে ঠোঙা বানায়।

বৃষ্টি ধরে এল। ঝোলাটা কাঁধে ওঠাতে ওঠাতে রতন বলল, আমি আর আসব না মাসি। এ কাজ ছেড়ে দেব।

—কেন কেন?

—আমি ঐ বেলেঘাটায় ইটভাটায় কাজ করব। আমাদের পাড়ায় একজন ইটভাটার দালাল আছে। আমরা তাকে দালালমামা বলি। সে ঠিক করে দিয়েছে। রোজ কুড়ি টাকা দেবে। দালালমামাকে পাঁচ টাকা করে দিতে হবে।

রতন চলে গেল। বৃষ্টি থামলে আর একটা পাড়ায় যাবে।

রতন আর আসে না। কতদিন হলো? তা মাস ছয়েক হবে বৈকি? না, বছর ঘুরে গেল বুঝি। কত ফেরিওয়ালা আসে যায়। কত শিশি, বোতল, পুরনো কাগজ কেনা-বেচা হয় এ পাড়ায়। কতরকমের ডাক শোনা যায়। কিন্তু রতনের গলা আর শোনা যায় না।

হঠাৎ একদিন আচমকা কানে এলো। শি—শি বো—ত—ল, পুরনো কা—গ—জ...আরে, রতনের গলা না? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। হ্যাঁ, তেমনি লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা ঝোলা কাঁধে ছিপছিপে ছেলেটা এদিকেই আসছে। এই এই রতন...। তুই কে রে? ছেলেটা কাছে সরে আসে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। আমি রতন না, রতনের ভাই জিতেন। তুমি বুঝি মাসি? দাদা আমাকে বলেছিল, এখানে একজন মাসি আছে। বিনা পয়সায় শিশি, বোতল দেয়। তার কাছে যাস।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি একরকমই চেহারা। ভাব-ভঙ্গি, কথা বলার ধরন-ধারণ একই রকম। মুখের চেহারায় সেই লাবণ্য। রতন কোথায়? তুই না স্কুলে পড়তিস? এখন এই করছিস...এক নিঃশ্বাসে অনেক কথাই বলে ফেললাম। জিতেন কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। রতনের মতো সহজ-ভাবেই ওদের কথা বলে চলল।

দাদার তো আর কাজ নেই। দাদা এখন হাসপাতালে। ইটভাটায় ইট টানতে টানতে অসুখ করে গেল। গলা দিয়ে রক্ত পড়ত। একদিন পড়ে গেল। দালাল-মামা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। শেষে সরকারী টিবি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। সেখানে পয়সা লাগে না। ওষুধ, ইনজেকশান, খাওয়া-দাওয়া দেয়। ডাক্তার বলেছে সারতে অনেক দিন সময় লাগবে। ইটভাটায় আর কাজ করতে

পারবে না। অন্য কি কাজ করবে কে জানে? মা বলেছে, দাদা সেরে উঠলে বাবার সেই পুরনো কাগজের দোকানের মালিককে বলবে। তারা নিয়ে নিতেও পারে। দাদা তো আর কাগজ যোগাড় করে দিত না, তাই মা আর ঠোঙা বানাতে পারে না। মা এখন তিনটে বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। বোনটাও সংগে সংগে যায়। মার হাতে হাতে কাজ করে। দুজনেই চা জলখাবার পায়। না, আমরা আর এখন ইস্কুলে কেউ যাই না। এভাবেই আমাদের চলছে। তবে আমাদের বস্তিতে দিদিমনিরা এসে সন্ধেবেলায় লেখা-পড়া শেখার ইস্কুল খুলেছে। সেখানে আমি আর বোন পড়ি।

হঠাৎ জিতেন হো হো করে হেসে উঠে বলে,

—দিদিমনিরা কী বলে জান? ওরা মাকে বলে তুমিও লেখা-পড়া শেখ। মা বলে আমার কত কাজ। হেসে উড়িয়ে দেয়। জান মাসি, একদিন কি মজা হলো? দিল্লির সরকার নাকি আইন করে ছোটো ছেলে-মেয়েদের রোজগারের কাজ করা বন্ধ করে দেবে। আমাদের বস্তিতে সব ছেলে-মেয়েরা কাজ করে। তাই সবাই ভয় পেয়ে গেল। একদিন না, দুটো বড়ো বড়ো ছেলে আর একটা মেয়ে খাতা-কলম নিয়ে হিসেব নিতে এলো কোন কোন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা কাজ করে, আর কোন কোন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ইস্কুল করে। তাই সবাই ভয় পেয়ে গেল। আমরা তো ভয়ে ঘাপটি মেরে ঘরের মধ্যে বসে থাকলাম। মা কিন্তু খুব চালাক। বাইরে এসে ওদের বলল। না না আমার ছেলে-মেয়েরা কেউ কাজ করে না, ওরা সব ইস্কুলে পড়ে। আমি একা কাজ করি। কে জানে বাবা, কাজ করে বললে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে, না কাজটা চলে যাবে। কে জানে, যাক, ওরা আস্তে আস্তে চলে গেল।

—কী আইন হবে মাসি? ছোটোদের কাজ করতে দেবে না। তাহলে আমরা খাব কী?

এই প্রশ্নের উত্তর আমিও জানি না। কী বলব, যতটুকু পারি অভয় দিলাম তাকে। জিজ্ঞাসা করি, রতন এখন কেমন আছে। এখন তোদের চলছে কী করে?

জিতেন বলে: ডাক্তার বলেছে দাদা সেরে উঠবে। মা রবিবার করে দেখতে যায়। মা, বোন আর আমি তিনজনই এখন কাজ করি। আমরা ভালোই আছি...।

সামনের দোতলা বাড়ি থেকে ডাক এলো এই শিশি-বোতল—এদিকে আয়। জিতেন তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিক বাদেই আমার কানে ভেসে এলো : শিশি—বোতল—পুরনো..।

এই রে। জিতেন চলে গেল। জিজ্ঞাসা করা হয়নি তো রতন কোন্ হাসপাতালে আছে। ওদের বস্তি বাড়িটাই বা কোথায়? কোথায় ওদের খবর পাওয়া যাবে?

জিতেনরা জানে না, জাতি সংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য-সংস্থা বা ভারত সরকার শিশু শ্রম নিয়ে কী কী গবেষণা আর কী ফাটকাবাজি খেলছে। জিতেনের শেষ কথাটা আবার মনে পড়ল : আমরা ভালোই আছি...।...।...।

কেন ?

কেন ? কেন এই অলিখিত গণ্ডি ? এই বন্ধন, বংশপরম্পরায় ধরে চলে আসা এই গতানুগতিক আবেষ্টন ? চারাগাছকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে না দেওয়ার এই প্রবণতা, আলো-বাতাস মেপে, নির্দিষ্ট পথ ঠিক করে দেবার জন্য এই লৌহজালের বেষ্টনী ? স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতা খর্ব করার এই কূটনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ? প্রকৃতির নিয়মের পরে মানুষের নিয়মের বাঁধা-বাধির এই পীড়ন। পদে পদে সমাজের অনুশাসন, সভ্যতার সীমারেখার পীড়ন। তোমরা বলছো এই বাঁধা নিয়ম মেনে চললেই আত্মবিকাশের সোজা পথ পাওয়া যাবে। জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি অর্জন করা যাবে। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা যাবে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করা যাবে। সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করা যাবে। সমাজেরও কাজে লাগবো। কিন্তু কি সেই কাজ ? কোন্ সেই সমাজ যা আমাকে এতদিন লালন-পালন করেছে এক বাঁধা নিয়মের গণ্ডির মধ্যে, আর আমার কাছ থেকে কি বা প্রত্যাশা করে সমাজ ? গতানুগতিক সমাজ সভ্যতার আমি সেই চির পুরাতন পদ্ধতিকেই উজ্জ্বল করবো, এই কি আমার কর্তব্য ?

আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়েছি। চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়ছে দুরন্ত ঢেউ। মাথার উপর উদাত্ত নীল আকাশ, মাটিতে জনসমুদ্রের মহা-কল্লোল, আছে দুঃখ-কষ্ট, শোষণ-বঞ্চনা। আছে অসহায় মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদ। আছে সুখী মানুষের আনন্দ উৎসব। উপচে পড়ছে উপরতলার আলোর ঝলকানি। জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েনের মাঝে জীবন জয়ের স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখি। আমি বেড়ে উঠতে চাই। এগিয়ে চলতে চাই। কিন্তু তোমরা কেন বার বার বেঁধে দিচ্ছ আমার পথের সীমারেখা ? আর নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছ, আমার প্রতিটি পদক্ষেপ ? এই যে তোমরা যারা আমার চেয়ে অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছো বলে নিজেদের অভিজ্ঞতার গর্ব কর, কর্তৃত্বের অহংকারে মশগুল, তারা যে আগেই আমার জন্য প্রতিদিনই চলাফেরা, ওঠা-বসা, পড়াশুনার ভাবনা-চিন্তার একটা নিয়ম বাঁধা ছক কষে রেখেছো। তাহলে তো তোমাদের পায়ে পা মিলিয়েই আমাকে চলতে হবে। আর তোমরা যেখানে থেমে গেছ, আমাকেও সেখানেই থেমে যেতে হবে। আমাকে একটু নিজের মতো করে এগোতে

দাও। নিজের পথের দিক্‌নির্ণয় করতে দাও। জীবনের একটা প্যাটার্নের মধ্যে বেঁধে ফেল না আমাকে। কী আমার জীবনের উদ্দেশ্য? এই আঠারো বছর ধরে শুনে আসছি ভাল করে লেখাপড়া না শিখলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কোন্‌ ভবিষ্যৎ? না, একটা ভাল চাকরি পাব না এবং একটা ভাল বিয়ে হবে না। তাই প্রাণপণে পড়ার বই গুলে খেয়ে একটার পর একটা ক্লাস পেরিয়ে এসেছি। শিক্ষা আমাকে কতটুকু দিয়েছে জানি না, তবে ডিগ্রি আমাকে চাকুরির বাজারে আর বিয়ের বাজারে চলনসই করে তুলবে জানি। কি কাজ আমাকে খুঁজতে হবে? না, মধ্যবিত্ত ঘরের উপযুক্ত কোনো সম্মানিত পদ অর্থাৎ স্কুল-কলেজে, অফিসে সরকারী বা বেসরকারী যথাসম্ভব উচ্চপদে। এই কি সম্মানের মাপকাঠি? আমি যদি বাসের কন্ডাক্টর হই অথবা মুদীদোকান করি, তবে তোমাদের মুখ ছোট হবে কেন? সমাজের সব কাজই তো কাজ। রোজগারের সংগে ডিগ্রির এই গাঁটছড়া কিসের জন্য? হ্যাঁ, পড়াশুনা নিশ্চয়ই ভালো কথা। তবে সে তো জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের জন্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিক্রি করে বড়লোক হবার ধান্দা কেন? আমার যা পড়তে ভালো লাগে তাই পড়বো, চাকুরির চিন্তা করে পরীক্ষার নম্বরের পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান হবো কেন? কেন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিটি ঘণ্টাকে এমন বেঁধে দিতে হবে তথাকথিত নিয়ম-শৃংখলার দাসত্বের ফাঁদে। আমাকে মানুষ হতে হবে! এ কোন্‌ ছাঁচে গড়া মানুষ? কোন টাকা রোজগারের কলের পুতুল? আমার রক্তমাংসের মানুষের সত্তার সংগে এই যান্ত্রিক মানুষের একাত্মতা কোথায়? আমার নিজস্ব 'আমির' সংগে তোমাদের গতানুগতিক ছাঁচে গড়া 'আমির' মিল কোথায়? কেন আমাকে বেরিয়ে আসতে দেবে না এই অন্ধ নিয়তির বন্ধন থেকে?

জানি, আমার সামনে আর কোনো পথ নেই। কলেজের ডিগ্রিটা পেয়েই আমায় ছুটতে হবে একটা মধ্যবিত্ত চাকুরির সন্ধানে। আর তোমরাও উঠে পড়ে লেগে যাবে একটা পাত্রের সন্ধানে। আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: বল, তোর কেউ আছে নাকি পছন্দের, না, আমরা পাত্র খুঁজবো? যেন একটা বিয়ে হয়ে গেলেই মেয়েদের জীবনের শেষ লক্ষ্যে পেঁৗছে গেলো। কেন এই অদ্ভুত নিয়ম বলতে পার? বিয়ে মানে কন্যাদায় উদ্ধার। অর্থাৎ কন্যা যেন তোমাদের ঘাড়ে একটা দায়! তাকে পাত্রস্থ করতে পারলে দায়মুক্ত হলে। বিয়েটা যেন বৈতরণী পার হওয়া। মেয়েদের যেন একটা আলাদা কোনো সত্তা নেই: বাপের হাত থেকে স্বামীর হাতে চালান করে দাও, তাহলেই সব সমস্যার নিষ্পত্তি। হ্যাঁ, মানি, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কটা স্বাভাবিক। মানসিক আকর্ষণ বা প্রেমের কথাও

মানি। তাই নর-নারীর মিলনও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রচলিত বিয়ের ব্যবস্থাটা কি সেই স্বাভাবিক মিলনের মর্যাদা রক্ষা করে? কখনই না। তোমরা তো বৈষয়িক চিন্তা কর, আর তোমাদের পরিবারের সুবিধার কথাটা, তাই বাজারে যাচাই করে পাত্র খোঁজার ব্যবস্থা। কি পাশ, কত রোজগার, বিষয়-সম্পত্তি কি কি আছে, বংশ মর্যাদা, আত্মীয়-স্বজন—সব কিছুর খোঁজ-খবর করতে হবে। অবশ্যই দেখতে হবে যে পাত্র যেন সবদিক থেকেই আমার চেয়ে কিছুটা বড়ো হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যক্তিত্বে-সম্পদে, স্বাস্থ্যে, বয়সে এবং এমনকি উচ্চতায়ও। অর্থাৎ সে যেন আমার দায়িত্বভার বহন করতে পারে এবং সত্যি সত্যিই আমার কর্তা হয়। হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে তথাকথিত সৎ পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা। অর্থাৎ কন্যাকে আর একজনের হাতে তুলে দেবার বা বিকিয়ে দেবার এক হাস্যকর সামাজিক অনুষ্ঠান—এরই নাম বিবাহ। এর মধ্যে নারী-পুরুষের প্রেমের মর্যাদাই বা কোথায়? আর নারী-পুরুষের সমান অধিকার বা সমান মর্যাদার কথা তো আসেই না। কারণ, এখানে প্রথম থেকেই ধরে নেওয়া হয় ঐ পুরুষটি হলো স্বামী বা কর্তা। আর নারী তার উপর নির্ভরশীল একটা পরাধীন জীব। বড়জোর তার গৃহিণী, ঘরের শোভা। এও কি একটা দাসত্ব-শৃঙ্খল নয়? বিয়ে হলে যদি স্বাধীনতা হারাতে হয়, তবে আমি বিয়ে করবো কেন? কেনই বা আমি আর একজনকে আমার সর্বময় কর্তা মনে করবো। আর কেনই বা আমি তার গলগ্রহ হতে যাব। তোমরা তো বল যা দিনকাল পড়েছে, তাতে সব মেয়েদেরই নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত। না হলে সংসার চলে না। সে তো ভাল কথা, আমিও নিজের পায়ে দাঁড়াবো। কিন্তু তবুও আমার একজন কর্তা চাই কেন? কেন এই শারীরিক-মানসিক দাসত্বের প্রতি এত টান? তবে আর স্বাধীন প্রেম মানে কি? কেন বল যে আমরা আধুনিক প্রগতিশীল, আমাদের স্বাধীন প্রেমের অধিকার আছে। আমার কি অধিকার আছে মনের মতো হলেই যেকোনো একজন পুরুষকে ভালবাসার? অধিকার আছে কি কোনো স্বার্থের কথা না ভেবেই তাকে জীবনের সঙ্গী করে নেবার? তেমন মানসিকতাই বা ক'জনের আছে। আমাদের স্বাধীন প্রেম মানে নিজেদের চৌহদ্দির মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থের দিকে নজর রেখে কাকে ভালোবাসা যায় ঠিক করে নাও। আর সেই স্বাধীন প্রেম যেন পরিবারের অভিভাবকদের পছন্দসই হয়, এমন একটা ইঙ্গিত আমাদের তাড়া করে। এ যেন গৃহপালিত পশুর খুঁটিটা ঠিক জায়গায় পুঁতে রেখে গলার দড়িখানিকটা লম্বা করে দেওয়া, আর চারণভূমির পরিধিটা প্রসারিত করে দেওয়া। এর নাম কি স্বাধীন প্রেম, না স্বাধীন জীবন?

কিন্তু তবুও হয়তো আমাকেও এই বাঁধাধরা পথেই যেতে হবে। হয়তো আমি বি এ বা এম এ ডিগ্রি পাবার পরে একটা চাকুরিও পেয়ে যাব—যদিও চাকুরির বাজার বড় মন্দা, তবুও ভালটাই ভেবে নেওয়া ভালো। হয়তো আমার একটা শুভ বিবাহ হয়ে যাবে আমার নিজগুণে অথবা তোমাদের দৌলতে। হয়তো আমিও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবো সেই দাম্পত্য জীবনের মোহে। হয়তো আমারও কোলে আসবে এক শিশু-সন্তান, যার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ফুলে-ফেঁপে উঠবো মাতৃত্বের গর্বে। হয়তো বা আত্মহারা হয়ে আমার স্বামীকে বলবো, দেখ দেখ ঠিক তোমার মুখের আদল। বাঃ! কি মধুর কল্পনা। চলমান স্রোতে ভেসে যাওয়ার কি অলস-বিলাস, কি আকর্ষণ! কিন্তু এই দাম্পত্য জীবনের তলায় যে দাসত্বের ভিত্তি রয়েছে তাকে আমি কেমন করে ভেঙে দেব? কেমন করে মুক্ত করবো আমার প্রেম, আমার নিজের সত্তাকে? কেন আমি পারবো না তোমাদের ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে একটা মুক্ত জীবনের পথের সন্ধানে যেতে।

তোমরা কথায় কথায় সমাজের দোহাই দিয়ে থাক। বলে থাক যে সমাজের আর পাঁচজনে যা করে, আমাকেও তেমনি করতে হবে। সমাজের চোখে আমাকে যেন বেশ ভাল দেখায়। আচ্ছা বলতে পার, সমাজের চোখে এই ভাল-মন্দের মাপকাঠিটা কি? আর সমাজকেই বা আমরা কোন চোখে দেখবো? সমাজের তো একটা গতি আছে। মানুষের সমাজ তো একটা অচল, অনড়, স্থবির একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হতে পারে না। সময়ের সংগে সংগে সমাজ তো বদলাবে, আর বদলাচ্ছেও। এই তো বনমানুষের যুগ থেকে আমরা ধাপে ধাপে কয়েক সহস্র বছরের পথ পেরিয়ে এসেছি। এক সময় তো আমাদের দেশে নরবলি হতো, সতীদাহ হতো। তারপরেও কতকাল পর্যন্ত মেয়েদের ঘরেই বন্দী থাকতে হতো। তাদের লেখাপড়া শেখার অধিকার ছিল না। এমন কি তাদের উপর এমনও কুসংস্কার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই বিধবা হবে। এমনই ধর্মীয় কুসংস্কার দিয়ে পদে পদে সমাজের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া হতো। এখনও তেমনি হয়ে থাকে। কিন্তু এখনতো আমরা অনেকটা এগিয়েছি। তবুও আমরা পদে পদে বাধা মানবো কেন? চারিদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত উন্নতি হয়েছে। আমাদের দেশেও হচ্ছে। আমরা আমাদের সনাতন ভারতের ঐতিহ্যের বড়াই করে থাকি। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের নামেই আমাদের একটা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়। আমাদের দেশের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য বলতে তোমরা বার বার আঙুল দেখাও সেই মান্ধাতার আমলে 'সতী-সাবিত্রী'দের দিকে। 'পতি পরম গুরু'র মন্ত্রের একটা মহিমার যাদু পরোক্ষভাবে ঘরে ঘরে কাজ করে আসছে।

নারীত্ব, মাতৃত্ব, এইসব মন ভুলানো কথার মায়ায় নারীদের একটা সীমার মধ্যে আটকে রাখার কাজ চলে। যেন সমাজে তার পারিবারিক জীবনের বাইরে একটা স্বাধীন সত্তা নেই, একটা পূর্ণ মানুষ হিসাবে সমাজকে তার কিছু দেবার নেই। সমাজের কাছ থেকে তার কিছু পাবার নেই। মুখে সবাই বলো, আজকালকার দিনে নারী-পুরুষ সবাই সমান, সবারই সমান অধিকার আছে। কিন্তু কাজের বেলায় সমাজ পুরুষের দিকেই পক্ষপাতদুষ্ট। এ সমাজকে আমার মেনে চলতে হবে কেন ? সমাজ তো এখনও মনে করে নারীরা যতটুকু অধিকার পেয়েছে, বা এগিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে সেও যেন পুরুষেরই দান। তাই আমাকে পুরুষদের তোয়াজ করে চলতে হবে। কেন ? মানুষকে শ্রদ্ধা করা বা ভালোবাসা এক জিনিস আর ভয় করা অন্য জিনিস। পুরুষদের হাতে সমাজের ক্ষমতা ও অধিকারের সিংহভাগ রয়েছে বলে আমাদের যেন নিজেদের ন্যায্য অধিকার পাবার জন্য ওদের কাছেই হাত পাততে হবে। সহকর্মীদের সাহায্য বা সহযোগিতা নেওয়া এক জিনিস, আর তাদের প্রভুত্ব মেনে নেওয়া অন্য জিনিস। কেন এমন একটা পরিবেশের পীড়নে আমরা হীনমন্যতায় ভুগবো ?

কথায় কথায় তোমরা বল দিনকাল খারাপ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে দুর্বৃত্তরা। এ বয়সের মেয়েদের সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। নারীদের উপর যৌন পীড়ন, নারী ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে চলেছে। রাত-বিরেতে একা একা চলাফেরা করলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কথাটা সত্যি, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণের ঘটনার আজকাল শেষ নেই। শুধু আমাদের দেশেই নয় বড় বড় সভ্য দেশেও এখনো একশ্রেণীর পুরুষদের হাত থেকে নারীদের রক্ষা করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা কবার জন্য সর্বত্র বড় বড় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অথচ আমরা নাকি সভ্যতার একেবারে চূড়ায় উঠে বসেছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-সভ্যতার বিকাশে একেবারে শিখর স্পর্শ করে আমরা বিংশ শতাব্দীর চৌকাঠ পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে যাচ্ছি। আর এখনও এমনই চলে আসছে যে, নারীদের পুরুষরা ইচ্ছেমতো ভোগ করতে পারবে। তাদের যৌন কামনা চরিতার্থ করার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। এটা কি অসম্ভব হাস্যকর কথা বলতো যে, একটা সমাজে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ভোগের বস্তু। শুধু পরাধীন নয়, দাস নয়, একেবারে ব্যক্তিগত ভোগের বস্তু। তাহলে এই সমাজকে আমি সভ্য সমাজ বলবো কেন ? আর কেনই বা এই সমাজের মুরুব্বিদের বানানো চলতি প্রথাগুলোকে আমাকে

মেনে চলতে হবে ? এই সমাজের সামনে ভালো মানুষের সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আমার চেষ্টা করতে হবে কেন ?

হয়তো তোমাদের কাছে আমার এসব কথার কোনো মানেই হবে না জানি, তোমরা বলবে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা ওরকম অনেক কথাই বলে, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো তাই যাবে। হয়তো আরও অনেকের মতই আমারও একটা স্বাভাবিক গতি হয়ে যাবে। হয়তো একটা মোটামুটি চাকুরিতে লেগে যাব এবং একটা মোটামুটি পাত্র-র হাতে আত্মসমর্পণ করে নিঃশব্দে মিশে যাব তোমাদের সবার জীবনের চলমান স্রোতধারার মধ্যে। তখন আমি আর খুঁজে পাব না আজকের এই বিদ্রোহী 'আমি' কে।

কিন্তু কেন। কেন আমাকে বাঁচতে দেবে না আমার নিজের মতন করে? ভাঙতে দেবে না এই বদ্ধ পরিবেশের বেষ্টনী ? আমি চোখ মেলতে চাই অনেক বড় উদার আকাশে। ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই উদার, মহৎ, বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের টানে। তোমাদের মতো আমিও তো সুখী হতে চাই। কিন্তু কোথায় পাব সেই অমৃতের সন্ধান। চারিদিকে তাকিয়ে পদে পদে মনুষ্যত্বের অপমান আর দাসত্বের গ্লানি আমাকে অস্থির করে তুলেছে। এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে কেমন করে বেছে নেব আমি একটি নিভৃত একক গৃহকোণ ? কেন সময়ের কাছে এই আত্মসমর্পণ ? তার চেয়ে আমাকে আর একটু সময় দাও, আর একটু ভাবতে দাও, আর একটু বেরিয়ে পড়তে দাও বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে। তোমরা যাঁরা তোমাদের অভিজ্ঞ হাতে এতদিন মানুষ করেছো আমাকে, আরও মানুষ করতে চাও, বলতে পার, কেন আমাকে ঠিক তোমাদেরই মতো মানুষ হতে হবে ? আরও অন্যতর, ভিন্নতর মানুষ হয়ে আরও বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে ছুটবো না কেন ?

কেন, কেন আমি বেরিয়ে পড়তে পারবো না তোমাদের দেওয়া গণ্ডির বাইরে ?

বাসন্তী ফিরে যাবে না

দেখা হলো ভোটের লাইনে। লাইনটা বেশ লম্বা। স্কুল ঘরের বারান্দা ছাপিয়ে গলির রাস্তা পেরিয়ে প্রায় বড়ো রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে। সারি সারি দাঁড়িয়েছে বাসন্তী রাণী লক্ষ্মী কল্যাণী—লম্বা লাইনটার মাঝামাঝি। দল বেঁধেই এসেছে ওরা একসঙ্গে। রোদের তাত মুখে এসে পড়েছে। আর কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে? সেই ভোর থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। পাশাপাশি চারটে লাইন পড়েছে। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। যেন কোন উৎসব আজ সবার।

উৎসবই বটে। নইলে কাজকর্ম ছেড়ে দলে দলে মানুষ কি আনন্দেই বা মেতে উঠেছে? বাসন্তীরা এক পাড়াতেই থাকে। ওরা কেউই আজ কাজে যায়নি। বাসন্তী আর রাণী রোজ সকালে পাশাপাশি বসে ফুটপাতে বাজার বিছিয়ে। বাসন্তী বসে এক ঝাঁকা মাছ, আর একখানা ধারালো বঁটি নিয়ে। রাণী তার পাশেই বসে শাক-সব্জি নিয়ে। লক্ষ্মী বাসন্তীদের বাড়ির পাশে এক বাড়িতে রান্নার কাজ করে। কল্যাণী এ পাড়ায় এক নার্সিং হোমে ঠিকে কাজ করে। মাঝে মাঝে কাজ পায় আবার পায় না। রুগীরা যখন যখন আলাদা এ্যাটেনডেন্ট রাখে, তখন কাজ পায়। আজ কিন্তু ওর কাজ ছিল। আরো এক সপ্তাহ এ কাজটা থাকবে। রোজ ১৫ টাকা করে পায়। আজকের টাকাটা ওর কাটা গেল।

কল্যাণী ফোঁস করে লক্ষ্মীকে বললো : তুই কিন্তু বেশ আছিস বাপু। লোকের বাড়িতে রাধিস-বাড়িস, খাস-দাস। কামাই করলি তো মাইনে কাটা যাবে না। আমার তো আজ কড়কড়ে পনেরোটা টাকা গেল। রাণী বললো আর আমাদের? আমার আর বাসন্তীর যে কত গেল। তার হিসেব কী? এতক্ষণে কত খদ্দের আসত, মাছ নিত, শাক নিত। বাসন্তী ঝাঁঝিয়ে উঠল : গেল তো গেল। অত আপশোস কিসের? না হয় একদিন না খেয়েই থাকব। গরিবদের জন্যে ভাল কাজ করবি, গরিবদের পার্টিকে ভোট দিবি, আর তার জন্য দুটো পয়সা ছেড়ে দিতে তোদের যে একেবারে কলজে ছিঁড়ে যাচ্ছে? তাহলে যা না, ঐ ওধারে ছোঁড়াগুলো তো ভোটের জন্য হাতে হাতে টাকা গুঁজে দিচ্ছে— যা না, নে গিয়ে। এই বলে সে একটা ঠেলা দিল রাণীকে, এগো না, লাইন চলছে যে।

ওরা পায়ে পায়ে এগোতে থাকে পোলিং বুথের দিকে। তবুও লাইন অনেকটা লম্বা। আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। বেলা তেতে উঠেছে, মাথায় মুখে রোদ এসে পড়ছে। বাসন্তী আঁচলটা টেনে মাথায় দিয়ে ছায়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। আর তখনই চোখে চোখ পড়ল ওর শিবুর সঙ্গে।

একটু দূরেই ওদের দলটা খুব উত্তেজিত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। এদিক ওদিক ছুটছে। পকেটের উপর হাত-মার্কা ভলাণ্টিয়ার ব্যাচ। শিবুর চোখে চোখ পড়ল বাসন্তীর। শিবু কটমট করে তাকালো। ভাবখানা যেন—ভালো চাস তো বেরিয়ে আয়! নইলে—। রাণীও দেখেছিল, শিবুকে ভাল করেই চেনে রাণী। ওর পাশেই বাসন্তী মাছের ঝাঁকা নিয়ে বসলে কতদিন উৎপাত করতে এসেছে শিবু। বাসন্তী তেড়ে উঠেছে। আঁশ বঁটি দেখিয়েছে। বাজারের লোক জড়ো হয়েছে। তবে না পালিয়েছে শিবু।

রাণী বাসন্তীকে একটা ঠেলা দিয়ে বললো: ঐরে! ঐ দ্যাখ তোর যম এয়েচে রে! এবার ভোট দিতে দিলে হয়। বাসন্তী ঝাঁঝিয়ে উঠল: আসুক, কত বড় ওর হিম্মত দেখা যাক। এতগুলো মানুষ আছে না?

তবুও কিন্তু বাসন্তীর বুকটা দুর দুর করে উঠল। কী জানি, কীভাবে আবার শোধ নেয় শিবু।

কাল রাত্রের কথা মনে পড়তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল বাসন্তীর। এক পকেট টাকা নিয়ে নেশায় টলতে টলতে দুম করে ঘরে ঢুকে বলেছিল, চল ফিরে চল। এই নে, টাকা চেয়েছিস, টাকা নে, কত টাকা লাগবে তোর মেয়ে মানুষ করতে?

বাসন্তী চিৎকার করে উঠেছিল: কে চেয়েছে তোমার পাপের টাকা? ফের ঘরে ঢুকেছ কোন মুখে? এ পাড়ায় ঢুকবে না বলছি।

তবে আমার মেয়ে আমি নিয়ে যাব—বলে চৌকির ওপর ঘুমন্ত দু'বছরের টুনটুনির দিকে এগিয়ে গেল শিবু। বাসন্তী ছুটে গিয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিল। এদিক ওদিক থেকে মানুষ জড়ো হয়ে গেল। বাসন্তীর বাবা হীরালাল ছুটে এসে 'কে রে'—বলে হাঁক পাড়ল। ততক্ষণে শিবু পালিয়েছে। টুনটুনি ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। বাসন্তী তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সেই দৃশ্যটা মনে পড়তেই বাসন্তীর ভাবনা হলো, কী জানি আজ আবার এক ফাঁকে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে না আসে। পাশের ঘরের বৌদির কাছে রেখে এসেছে টুনটুনিকে। বাবাও তো ভোটে বেরিয়েছে। অন্যদিন এ সময় ঘরে থাকে, তাই বাসন্তী নিশ্চিন্তে কাজে বের হয়। মাছ বিক্রি করার কাজ, বাড়ি

ফিরতে বারোটা বেজে যায়। স্টেটবাসের কনডাকটারের কাজ থেকে বাবা রিটিয়ার করার পর এই একটা সুবিধা হয়েছে, তা ছাড়া বাবার দুটো চোখেই ছানি পড়েছে, তাই বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারে না। সন্ধে বেলায় ইউনিয়ন অফিসে, কি ভোটের অফিসে যায়। বাবা তাকে বাইরের ঘরটুকু ছেড়ে না দিলে আজ সে টুনটুনিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াত? বাবার বিচার বুদ্ধি আছে। শত দোষ করলেও বাসন্তীকে সে ঠেলে দেয়নি। ভাইয়ের সংসারের বোঝা করেও রাখেনি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। ও পাড়ার বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোর পাল্লায় পড়ে বাসন্তী যখন টো টো করে ঘুরে বেড়াত, বাবা কিন্তু অনেকবার বারণ করত। মা-মরা মেয়েটার উপর হীরালালের বড়ো মায়া। জোর করেনি তার উপর। বাসন্তী তার বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

আবার একটা বিভীষিকা ভেসে উঠলো বাসন্তীর সামনে। সেই ভয়ংকর রাতটার বিভীষিকা। যেদিন শিবু আর তার সাকরেদরা বাসন্তীকে জোর করে ধরে নিয়ে শিবুদের ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। শিবুকে বিয়ে করতে রাজি না হলে দরজা খুলবে না। বাসন্তী ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তাকে 'হ্যাঁ' বলতে হয়েছিল। সেই রাত্রেই ট্যাক্সি করে বাসন্তীকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল শিবু। শিবুর বাড়িতে তার বিধবা বুড়ো মা পর্যন্ত শিবুর ভয়ে কথাটি বলতেন না। বাড়িটায় ছিল ঐ বাউণ্ডুলে দলের আড্ডাখানা। বাসন্তীকে আর বাপের বাড়ি আসতে দিত না। বাসন্তীর বাবা হীরালাল কতবার এসে এসে ফিরে গেছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হীরালাল কিছু বলতো না শিবুকে তখন। প্রথম প্রথম শিবু যত্নও করতো বাসন্তীকে। ক্রমশ নিজমূর্তি ধরেছিল। ঐ দলটা কী করত আর কী না করত? ওদের টাকা পয়সা কোথা থেকে আসত, বাসন্তী বুঝতে পারত না, এখন বুঝতে পারে। কিছু বললেই শিবু তার বাপ তুলে গালাগাল দিত। মারধর করত। সেসব কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

যেদিন শিবুর বন্ধু স্বপনটা মাতাল হয়ে চেপে ধরেছিল বাসন্তীকে, শিবু ঢুলছিল নেশার ঘোরে। সেই রাত্রেই পালিয়ে এসেছিল বাসন্তী। বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিল হাউমাউ করে। টুনটুনি তখন ছ'মাসের পেটে। তখন যদি তার বাবা আর বাবার ইউনিয়নের নিশিকাকা রুখে না দাঁড়াত, তার পাড়া সমিতির শান্তা মাসিমা, মীনাদি সাহস না দিত, তবে আজ বাসন্তীর কী দশা হতো?

তারপর প্রায় তিন বছর হতে চলল বাসন্তী শিবুর কাছে ফিরে যায়নি।

শিবুর মা মারা গেলে ডাকতে এসেছিল, তাও যায়নি। জানে যে গেলেই আটকে ফেলবে। কত চোখ রাঙানি, ভয় দেখানো সহ্য করেছে। এখন বাসন্তী মুক্ত। তার আর কোনো ভয় নেই। এখন সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে কিছু দিন বাড়ি বাড়ি গম বিক্রি করত। তারপর কেরোসিন তেল বিক্রি করত। এখন একটা মোটামুটি স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাজারের কাছে ফুটপাতে বসে মাছ বিক্রি করে। মাছ সে নিয়মিতই পায়। বড়ো ব্যবসাদারদের সঙ্গে চেনাজানা হয়ে গেছে, বাঁধা খরিদ্দারও কয়েকজন হয়ে গেছে। খেটে খেলে দুটো পেট তাদের ভালোভাবেই চলে যাবে। এখন আর বাবার কাছেও হাত পাততে হয় না বাসন্তীর। বরং নিজেই বাবাকে এবার পুজোয় একখানা ধুতি কিনে দিয়েছে। দরকার মতো এটা ওটা কিনে দেয়। মেয়েটাকে সে ভালোভাবে মানুষ করবে। লেখা-পড়া শেখাবে। নিজে দুই ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, মেয়েকে সে পাশ করাবে।

যেদিন থানা থেকে পুলিস এনে শিবু জোর করে নিতে এসেছিল বাসন্তীকে, পাড়ার লোক জড়ো হয়েছিল। চেঁচিয়েছিল বাসন্তী। শেষে যাবার সময় শিবু যে সব মুখখিস্তি করেছিল, শুনে তার গা ঘিন ঘিন করেছিল। সেই দিনই রাগে ঘৃণায় মুছে ফেলেছিল বাসন্তী শিবুর হাতের কালীঘাটে পরানো সিঁদুর। শিবু যেন আর কখনও তার স্বামী বলে পরিচয় না দিতে আসে।

ভয় কিসের বাসন্তীর? সে তো এখন স্বাধীন। নিজেই পাড়ার মহিলা সমিতির একজন কর্মী। ভোটের কাজও করেছে অনেকের সঙ্গে। এই যে রাণী, লক্ষ্মী, কল্যাণী—এদের তো বাসন্তী নিয়ে এসেছে ভোটের লাইনে। বাসন্তীর যে এত তেজ ছিল তা কি সে নিজেই জানতো?

দুম করে একটা আওয়াজ হলো, বোমা ফাটলো বোধ হয়। এদিক ওদিক ছুটতে লাগল সবাই। ভোটের লাইন এলোমেলো হয়ে গেল। রাণী চেঁচিয়ে উঠল: খুব হয়েছে, চল্ চল্ আর ভোট দিতে হবে না—প্রাণ নিয়ে পালা।

লক্ষ্মী কল্যাণী একপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। বাসন্তী মুহূর্তে লাইনের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো: কেউ লাইন থেকে সরবে না, ঠিক হয়ে দাঁড়াও সব, ভোট দিতে এসেছি, ভোট দিয়ে তবে যাব। দেখি কে পারে আমাদের ভোট বানচাল করতে। ততক্ষণে ভলান্টিয়াররাও এগিয়ে এলো লাইন ঠিক করতে। আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো ভোটের লাইন স্কুল ঘরের দিকে।

মারামারি থেমে গেছে। পুলিস একদল ছেলেকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে।

আপাতত অবস্থা শান্ত। এতক্ষণে বাসন্তীরা স্কুল ঘরটার বারান্দায় এসেছে। ভিতরেই ভোটের বাক্স। ওদের মধ্যে প্রথমে ঢুকল ভোট দিতে লক্ষ্মী। তারপর কল্যাণী, তারপর রাণী ঢুকবে। বাসন্তী তাদের সবার পিছনে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, তোদের আগে দেব, তোদের ফেলে আমি যাব না, ভয় নেই। বেলা তখন বারোটা বাজতে চলেছে।

বাসন্তী ভাবছে: যাদের পুলিস ধরে নিয়ে গেল, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই শিবুও আছে। ওরাই নিশ্চয় বোমা পটকা ফেলে ভোট বানচাল করতে গিয়েছিল। নইলে, গেলই বা কোথায় ওরা সব ? একটাকেও তো দেখা যাচ্ছে না ধারে কাছে। পুলিস ধরে নিয়ে গেছে, বেশ করেছে। থাক আটকা থানার গারদে। শিক্ষা তো হবে না ? কতবার পুলিস ধরল আর ছাড়ল তার ঠিক নেই। কী ভাবেই ছাড়া পায় ওরা, কে জানে ? শিবুটার কি আর শিক্ষা হবে ? আর কি ও মানুষ হবে ? কেমন করে হবে, কবে হবে ? মানুষটার জন্য মাঝে মাঝে মায়া যে না হয় বাসন্তীর তা নয়। এক এক সময় ওকে ভালোও লাগতো। মেয়েটা পেটে এলে বাসন্তীর উপর ওর বেশ টান হয়েছিল। কেমন নরম নরম চোখে তাকাত বাসন্তীর দিকে। তখন ওর মুখখানা বেশ সুন্দর দেখাত। দেখতে তো আর খারাপ নয়—তবে ঐ-ঐযে স্বভাবটাতেই খেয়েছে। থানা পুলিসের শাস্তি টাস্তি হয়ে একদিন যদি শিবু ভাল হয়ে ফিরে আসে ? আর ও পথে না যায় ? শিবু কি আর ঐ সব্বনেশে পথ থেকে ফিরে আসবে কখনও ?

বাসন্তী কিন্তু ফিরে যাবে না। না, কখনই না। বাসন্তী তার পথ চিনে নিয়েছে।

বাসন্তী হালদার—বাসন্তীর নাম ডাকা হলো। ভোটের ঘরে পাড়ার চেনা মুখগুলো দেখে বাসন্তীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাজেশ্বরী

মা আপনাকে ডাকছেন।

একটি ফুটফুটে মেয়ে। বছর দশ বারো বয়েস হবে। তার কোলে ততোধিক ফুটফুটে একটি নেহাতই ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটি তার লাজুক লাজুক মুখটা নিচু করে বলল: ঐ যে, ঐ আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। মা আপনাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

কে তুমি? নাম কি?

আমার নাম ছন্দা।

পাশের এক মহিলা বলে উঠলেন: ঐ তো আমাদের হীরু মাস্টারের মেয়ে। ওর মা চলে গেল তাড়াতাড়ি কাজ আছে বলে...উনিই তো আমাদের সমিতির সম্পাদিকা। আচ্ছা, তুই যা ছন্দা, আমরা নিয়ে যাব ওকে সঙ্গে করে।

গ্রামের নির্বাচনী সভা। দুপুরের সভা শেষ হতে হতে সন্ধে হয়ে এসেছে। শীতের আমেজ জড়ানো সন্ধে। বাঁশ বনের পিছন দিয়ে এক ফালি চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে। বহুদিন পর কলকাতা শহর থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামের এই সবুজের সমারোহে ছাওয়া সন্ধেটা বেশ লাগছে। একে একে আসর ভেঙে যেতে আমরাও উঠে পড়লাম।

মেয়েটি কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে ছোটবোনকে কোলে নিয়ে। আমাদের সঙ্গে না নিয়ে ও যাবে না। নিশ্চয়ই খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপার আছে কিছু, তাই একটু বিব্রত বোধ করছিলাম। তবুও অগত্যা যেতেই হলো।

এ কি? কে এ? রাজু তুই? এখানে!

কথা শেষ হবার আগেই রাজু দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল: ভাবলাম বুঝি চিনতেই পারবি না—নেতা-টেতা হয়ে গেছিস তো? তাই ভয় হচ্ছিল বুঝি মনেই পড়বে না আমাদের মতো সামান্য লোকদের। আয় ভিতরে, এই আমার বাড়ি, গরিবের কুটির—

কতকাল পরে সেই আমাদের কলেজ পালানো, লাভম্যারেজ করা বেপরোয়া বন্ধু রাজু ওরফে রাজেশ্বরীর সঙ্গে দেখা। কত বছরের হারিয়ে যাওয়া অনেক কথাই

মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে ভেসে উঠল। রাজুর কথা কি কখনো ভোলা যায়? কতবার তাকে টানাটানি করেছি আমরা কত আন্দোলনের সময়। কত তিরস্কার করে বলেছি: তুই বড় স্বার্থপর, সবই বুঝিস অথচ কাজের মধ্যে নামতে চাস না। শুধু নিজের ক্যারিয়ার আর নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই তোর মাথায় ঢোকে না।

আমাদের রাজনীতির হুজুগে মাতা দলের মধ্যে রাজু ছিল জ্ঞানপাপী। জেনে শুনে জেগে জেগে দূরে সরে সরে থাকত, আর সবারই উপরে চটাং চটাং কথা বলত। সেই খেয়ালী মেয়ে রাজু শেষ পর্যন্ত বি. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগেই তার পাড়ার কারও সঙ্গে লাভম্যারেজ করে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। একবার শুনলাম ওরা পাটনায় থাকে। আবার কিছুদিন পর শুনলাম, এদিকেই কোথায় যেন ওর বর আর ও দুজনেই একটা স্কুলের দুই বিভাগে মাস্টারী করে। কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ না থাকলে যা হয়—রাজুর সঙ্গে আর দেখাও হয়নি, তার খবরও পাইনি বহুকাল থেকে।

ভাল লাগল। বিস্ময়ও লাগল কম না। সেই বিলাসী, খেয়ালী, আত্মসুখী মেয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা এই এঁদো পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ে আছে।

ঝকঝকে তকতকে পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি। ঘেরা উঠোনের একপাশে টিউবওয়েল পাতা। দাওয়ার কোলে কোলে গাঁদা, সন্ধ্যামণি, আর কি কি যেন ফুটে আছে। দাওয়ার উপর বিছানো মাদুরে তখন উপুড় হয়ে খেলা করছে রাজুর ছোট্ট ননীর পুতুলের মতো মেয়েটি। তার দিকে আমাকে বিশেষ আগ্রহে তাকাতে দেখে রাজুই বলল: আর বলিস না, পাপের শাস্তি যত। ঐ তো দ্যাখ, বারো বছরের মেয়ে ছন্দা, তারপর এতকাল পরে আবার এই এক কন্যে এসে জুটেছেন।

আহা, এমন ফুলের মতো শিশুর সম্বন্ধে অমন করে বলিস কেন রে; আদর করে কোলে তুলে নিলাম শিশুটিকে। ভারী নরম তুলতুলে মেয়ে, মধুর স্পর্শ যেন লাগল আমার গায়ে। রাজু আশ্চর্য মেয়ে। এই পাড়াগাঁয়ে, এই পরিবেশেও যেন বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছে জীবনের ফুল। বেশ লাগছে ওর বাড়িতে এসে। কোন অবস্থাতেই ও কারও কৃপার পাত্র হয়নি, ঈর্ষার পাত্রই হয়েছে। এখানেও ও বেশ নিজেরই রসে মজে আছে মনে হয়।

কলকাতা ফিরে যাবার গাড়ি রাত দশটার পর। এই সময়টুকু রাজুর এখানেই আমার থেকে যাওয়া ঠিক হলো। প্রতিবেশিনী আরও দুজন মহিলাও বসে রইলেন। সকলে মিলে বারান্দায় বিছানো মাদুরে বসে চা মুড়ি, ঘরে তৈরি দুধের চাছির নাড়ু নিয়ে বেশ জমিয়ে বসা গেল। রাজু তাহলে শেষ পর্যন্ত রাজনীতির

আন্দোলনে নেমেছে ? ওদের বাড়িতেই সমিতির অফিস। আবার একটা বাচ্ছাদের স্কুলও চলে এখানে। গ্রামের সাধারণ মানুষের নানা আন্দোলন সংগঠনের একটা আস্তানা এদেরই বাড়িতে। মনটা আমার তৃপ্তিতে ভরে উঠল। যাক, অবশেষে তোর হারতে হয়েছে তো? দেখলি তো, আমরাই জিতলাম। তোকে আন্দোলনের কাজে নামতেই হয়েছে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু...কৈ? তিনি? এই রঙ্গমঞ্চের নায়ক ? তোর কর্তাটিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ?

কি যেন একটা ভুল করে ফেললাম। আমার পাশের প্রতিবেশিনী কেমন যেন অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠলেন। রাজু আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইল। তার কপালের সিঁদুরের টিপটি জ্বলজ্বল করছে। মুখে হাসি টেনে বলল: উনি ঐ উপরের ঘরে আছেন। আগে চা-টা খেয়ে নে, তারপর নিয়ে যাব। কী যেন আশংকার ছায়া নামল। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। রাজুর স্বামী কি তবে শয্যাশায়ী? স্বামী থাকেন তো এখানে? কেমন যেন রহস্য মনে হচ্ছে। আবার ভাবি, না, এই তো ওদের এতটুকু ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা রয়েছে রাজুর কোলে লেপ্টে—ওদের দাম্পত্য-জীবন তবে নিশ্চয়ই সুখেরই আছে। রাজুর স্বামী ভদ্রলোককে কিন্তু আগে কোনদিন দেখিনি। শুনেছিলাম তিনি সুপুরুষ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু আর্থিক অবস্থা যে ওদের ভাল ছিল না তাও শুনেছিলাম। আর সেই জন্যই রাজুদের বাড়ির লোকেরা অত বেঁকে বসেছিলেন ওদের বিয়েতে।

মনে পড়ে গেল, এ বাড়িতে আসবার আগে রাজুর বড় মেয়েটিকে দেখিয়ে কে যেন বলেছিল: ঐ তো হীরুমাস্টারের মেয়ে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক এখানকার কোন স্কুলের মাস্টার। তা, এত লোক জড় হলো মিটিং-এ, সাধারণ নির্বাচনের মিটিং, গ্রামময় হৈ হৈ ব্যাপার, উনি তাহলে লোকজনের মধ্যে বেরোননি কেন? তবে কি মাথা খারাপ? ...না...এমন কোন অসুখ...যাকগে, গিয়ে দেখা করলেই তো চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটে যাবে।

আমাকে একা সঙ্গে নিয়ে রাজু উপরের ঘরে এল। ঘরের একপাশে টিম্‌টিম্‌ হারিকেনের বাতি জ্বলছে। চৌকির উপর বিছানায় শুয়ে আছেন যিনি বোঝা গেল তিনিই রাজুর স্বামী। মাথাটা বালিশ থেকে সরে গিয়ে চৌকি থেকে প্রায় ঝুলে পড়েছে, আর মুখ দিয়ে একটা গোঙানির মতো শব্দ বেরুচ্ছে। রাজু তাড়াতাড়ি তার স্বামীর ঝুলে পড়া মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে চৌকির উপর বসল। আমাকে পাশের একটা বেতের মোড়া দেখিয়ে দিল বসতে, রাজুর কোলের উপর তার স্বামীর মাথাটা অনবরত থর থর করে

কাঁপতে লাগল। তাঁর বোধশক্তিহীন চোখ দুটো এদিক ওদিক ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকাচ্ছে।

রাজু কিন্তু খুব সহজ গলায় বলে গেল তাদের অনেক দিনের কথা। ... তারপর এখানে স্কুল মাস্টারী নিয়ে এসে বসলেন। বললেন, এখানেই আমরা ভিটে গেড়ে বসলাম, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবো না। এখানের সবই আমাদের খুব ভাল লেগে গেল। এ গ্রামের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে উনি একেবারে ডুবে গেলেন। সবাই বলত, হীরু মাস্টার আমাদের মাথা। আর সেই মাথাটার উপরই শত্রুদের আক্রোশ ছিল সব চেয়ে বেশি। তাই সেবার কৃষকদের ধানের লড়াই-এর সময় জোতদারের ভাড়াটে গুন্ডারা এই মাথাটা ফাটিয়ে তবে তাদের কার্যসিদ্ধি করেছিল ...সেই থেকে মানুষটা এই এক রকম হয়ে পড়ে আছে। অনেক ডাক্তার ওষুধ হয়েছে। কিন্তু এ সারবার নয়, স্মৃতিশক্তি কিছুই নেই...গাঁয়ের সবার কাছ থেকে যা শ্রদ্ধা ভালবাসা সাহায্য পেয়েছি, তার ঋণ শোধ হবে না কোনদিনও।... স্কুল থেকে একটা পেনশন দেয়। আমি নিজেও ঐ বাইরের ঘরে একটা প্রাইমারী স্কুল চালাই...তাছাড়া এখানকার পার্টি, কৃষক সভা সকলেই আছে আমাদের। শুধু এই মানুষটাই যে কাছে থেকেও কতদূরে চলে গেছেরে...আমার নাগালের বাইরে!

গলা ধরে এল রাজুর, আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। রাজু আবার বলল: তোদের কাছে আমি কত জিদ করে বলতাম...আমি বাপু ওসব রাজনীতি আন্দোলনের মধ্যে নাই। এখানে আসবার পর পর্যন্তও ছিলাম না এ সব কাজের মধ্যে। উনি এ সব নিয়ে মেতে থাকতেন, আমি কোনদিন বাধা দিইনি। কিন্তু আমাকে উনি শত চেষ্টা করেও কাজে নামাতে পারেননি। আমার মনে আমি ঘর সংসার নিয়ে হেসে খেলে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু আমি আমার জিদ রাখতে পারলাম না রে...যেদিন ওঁর এই মাথাটার উপর শত্রুর লাঠির বাড়ি পড়ল, সেদিন থেকেই আমি জ্বলে উঠলাম। এখন আমি এ সব কাজ না হলে আর থাকতে পারি-নারে... বুকের ভিতরটা জ্বলে যায়...কিন্তু এ মানুষটা আর কিছুই বুঝতে পারে না—জানতেও পারল না একবার যে আমি তার রাজেশ্বরী এখন সারাক্ষণ তারই দেওয়া কাজের মধ্যে ডুবে থাকি...কতবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছি: জান, আমি এখন তোমাদের কাজে নেমেছি কিন্তু...আর তো কোনদিনই আমার কোন কথা ওর কানে পৌঁছবে না। কতদূরে যে চলে গেছে। অবোধ অসহায় শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে আছে যেন আমাকে...এর মধ্যে আবার কোলে এসেছে ঐ অভাগা মেয়েটা। তাকে তো কোনদিন উনি চিনতেও পারেন নি, একবার কোলেও করেননি।

রাজু গভীর মমতায় তার স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ...বড় অসহায়!

আমার গলার কাছে যেন আমার সমস্ত অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠেছে। ওদের দিকে আমি তাকাতেও পারছি না, আর কিছু বলতেও পারছি না। পাশের জানালার ফাঁক দিয়ে রাজুর মুখের উপর একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। গলা দিয়ে আমার আওয়াজ বের হলো না। মনের কথা মনেই রয়ে গেল: রাজু, রাজেশ্বরী—তোমাকে কেউ হারাতে পারে না। তোমারই জয়!

দ্বৈত

উঃ, আর পারি না। ঘাড় যে একেবারে ব্যথা হয়ে গেল।

কপট ঝংকারে মুখ ফেরায় তপতী।

বাঃ, ঠিক, ঠিক হয়েছে। আর এক সেকেন্ড লক্ষ্মীটি। ঠিক এই গ্রীবা ভঙ্গিটির জন্যেই আমার তুলি অপেক্ষা করছিল।

তরতর করে কাগজের উপর রং-এর তুলি বুলিয়ে যায় শ্যামল।

রৌদ্রদগ্ধ দুপুরের ছায়াঘন গাছের নিচে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে এলিয়ে রয়েছে তপতী, হাতে একখানা কী যেন বই খোলা। পরনে অতি সাধারণ শাড়ী-ব্লাউজ। নিতান্তই ঘরোয়া ভাব। এলায়িত চুলের গোছা বাতাসে লুটিয়ে লুটিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে শ্যামলের দিকে চেয়ে আছে তপতী। শ্যামল তার ছবি আঁকছে তন্ময় হয়ে।

কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী মিলে এক্স্‌কারশনে এসেছে ওরা শহর থেকে অনেকটা দূরে, ওদেরই বন্ধু সুনীলদের দেশের বাড়ি। শ্যামলের অনেকদিনের মনের সাধ তপতীকে সামনে বসিয়ে মনের মতো করে তার একখানা ছবি আঁকবে। আজ তাই অনেক চেষ্টায় হাতব্যাগে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে ওরা দুজন অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে দল ছেড়ে এই নিরালা আমবাগানে এসে বসেছে।

পিছনের ওরা সবাই খানিকবাদেই এসে পড়লো এদিকে। বাগানের ওধার থেকে কাদের যেন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন ডাকলো শ্যা-ম-ল-ত-প-তী—

চমকে উঠে দাঁড়ালো তপতী। সম্বিৎ ফিরে এলো তার। না, এতো সেই ছায়ামধুর আম্রকুঞ্জ নয়। তপতীদের ছোট্ট সংকীর্ণ বাইরের বসবার ঘর।

এতক্ষণে তপতীর খেয়াল হলো যে শ্যামল কিছুই খায়নি। খাবারের প্লেটটা দূরে ঠেলে রেখে দিয়ে টেবিলের খবরের কাগজখানার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এ কি চেহারা শ্যামলের! এই কি সেদিনের সেই একান্ত নিবিষ্ট শিল্পী? দুনিয়ার বিতৃষ্ণা যেন আজ ভেঙে পড়েছে শ্যামলের সারা দেহে। অশান্ত উচাটন মন।

ওকি, খেলে না? নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল তপতী।

বলেছি তো ক্ষিদে নেই। রুক্ষ সংক্ষিপ্ত জবাব।

পাশাপাশি বাড়ি। কাল রাত্রে যে শ্যামলের বাড়ি হাড়ি চড়েনি, সকালেও যে চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি ওর, তা জানে তপতী। তবুও এই দারিদ্র্য রুক্ষ যুবককে খাবারটা খেয়ে নিতে আর একবার অনুরোধ করতে পারল না তপতী। জানে, শ্যামলের দারিদ্র্যের অভিমানে আঘাত লাগলে সে যে কিভাবে ফেটে পড়বে তার ঠিক নেই। অগত্যা ক্ষুধার্ত শ্যামলের সামনে থেকে খাবারের প্লেটটা সন্তর্পণে সরিয়ে নিল তপতী।

দু'জনেই বসে রইল অনেকক্ষণ চুপচাপ। যেন কোনো কথা নেই ওদের। তপতী দুই একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। অফিসের বেলা হচ্ছে তার। সরকারী অফিস, ঘড়ির কাঁটায় চলতে হয় তপতীকে। ভাল লাগে না রোজ রোজ নিয়মে বাধা জীবন। কিন্তু চাকরি করা মেয়ে বলেই না আজ তপতীর এত স্বাধীনতা এ বাড়িতে। এই যে শ্যামলের সঙ্গে মুখোমুখি বসে আছে, কেউ তো কিছু বলতে পারছে না। আগে আগে শ্যামলের সঙ্গে মিশবার জন্য কত লুকোচুরি, কত ছল-চাতুরিই না করতে হতো। বৌদি আবার নিজের হাতেই শ্যামলের জন্য চা খাবার দিয়ে যায়। মা সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলেন, হ্যাঁরে, ঐ শ্যামল ছেলেটা কি এখন কিছু চাকরি-বাকরি করে? এসব লক্ষণ শুভ বইকি। একে স্বাধীনচেতা, তারপর চাকরি করে সংসারের সাশ্রয় করে। তপতী এখন বাড়িতে স্বপ্রতিষ্ঠিত।

শ্যামলই প্রথমে কথা বললো: বিকেলে আসছ তো আজ আমাদের আর্ট এগজিবিশনে?

তপতী: নিশ্চয়ই। তুমি কিন্তু থেকো ঠিক সময়ে।

শ্যামল: হ্যাঁ, থাকব, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এসো। যাই, আবার জামা-কাপড়টা কাচতে হবে। জানো তো, আমাদের বাড়ির নতুন ব্যবস্থায় আমরা সকাল আটটা থেকে নয়টা—এই এক ঘণ্টা মাত্র কলের জল পাব। একটি কল আর চারটে ভাড়াটে। রোজ ঝগড়া। অবশেষে কাল সব বাড়ির কর্তারা বসে কলের জলের র‍্যাশন করেছে—আমাদের ঐ এক ঘণ্টার বরাদ্দ।—বলেই শ্যামল অহেতুক জোরে হো হো করে একটা ফাঁকা হাসি হেসে উঠল। তারপরই বলল: চলি—

দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। তপতী একটু আমতা আমতা করে বলল—জানো, দাদা বলছিলেন কি—

শ্যামল: কি বলছিলেন?

তপতী: বলছিলেন যে, ওঁদের অপিসের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের সেই পোস্টটা নাকি এখনো খালি রয়েছে। যদি তুমি একটা দরখাস্ত—

তপতীকে কথা শেষ করতে দিল না শ্যামল। রুক্ষ তীক্ষ্ণ গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল —আবার তুমি সেই কথাটা বলছ? ছিঃ! তুমি যে এত নিরেট হতে পারবে তা আমি ভাবতেই পারি না। তুমি—তুমিও শেষটায় মা, দিদি, ওদের মতো শুধু সংসারটাই বুঝলে? আর—আর আর্ট আমার কাছে কিছুই নয়? একটা ফাইন আর্টের উত্তীর্ণ শিল্পী—সে যদি টাকার জন্য কমার্শিয়াল আর্টের কাছে বিক্রীত হয়ে যায়...আমার ল্যান্ডস্কেপ...আমার মনের ছবি...সব ছেড়ে দিয়ে শেষটায় আমি তোমার ঐ কামিনীরমণ তেল আর চরণকমল আলতার বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার চাকরি নেব? ছিঃ ছিঃ তপতী, তুমি কি! রাগে, দুঃখে, অভিমানে শ্যামলের গলা ধরে এলো। তপতীর দিকে আর ফিরে না তাকিয়েই শ্যামল দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তপতী শ্যামলের যাবার পথে শূন্য দৃষ্টি মেলে রইল। শ্যামলের সার্টের পিছনের ময়লা দাগটা শুধু তার চোখে পড়লো। শ্যামলের যে মাত্র একটাই ধুতি-সার্ট বাইরে যাবার মতো, এই কথাটাই এই মুহূর্তে তপতীকে সবচেয়ে পীড়া দিতে লাগলো।

সকাল থেকেই মুষড়ে গেছে তপতী। সারাদিন মনমরা হয়ে কাজ করেছে অফিসে। কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলতেও ইচ্ছা হয়নি। শ্যামলের তিরস্কারের জ্বালাটা যেন ভুলতে পারছে না কিছুতেই। শ্যামল কি কোনোদিনই প্র্যাকটিক্যাল হবে না? এই টাকা-আনা-পাই-এর স্থূল জগতে ও কি করে বাঁচবে আর কি করেই বা ওরা ঘর বাঁধবে? উঃ শ্যামল! তোমাকে সহ্য করাও যায় না, হারানোও যায় না। চোখ দুটো জ্বালা করে তপতীর।

ছুটির পর বিষণ্ণ মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে তপতী এসে পেঁছাল শ্যামলদের আর্ট এগজিবিশনে। ভাবলো, চুপচাপ ঘুরে আসবে, শ্যামলের সঙ্গে বেশি কথা বলবে না। একেই রেগে আছে, আবার লোকের সামনেই হয়তো কি বলতে কি বলে বসবে তার ঠিক নেই।

কিন্তু এগজিবিশন হলের গেটের কাছে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেছে তপতী। ধুতি-সার্টটি ইতিমধ্যে কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে পরেছে শ্যামল। চুল আঁচড়েছে সযত্নে। ফিট্‌ফাট্‌ চেহারা, প্রফুল্ল মন। চঞ্চল ভঙ্গিতে ছুটে এসেই তপতীর হাত ধরে এক ঝাঁকুনি: এই জানো, জানো, কি হয়েছে?

তপতীকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল শ্যামল। তপতী কিছু আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে?

শ্যামল কাঁপা গলায় বলল : আমার একখানা ছবি আজই বিক্রি হয়েছে নব্বই টাকায়—কি ভাবছ তুমি? দুনিয়া কি ইঁট কাঠের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে? শিল্প কি মরে যাবে? না, না, কক্‌খনো না—আছে, আছে অনেক সমজদার ফাইন আর্টের, বুঝলে? ঐ যে সেই ল্যান্ডস্কেপটা—তুমি রেগে গিয়েছিলে, আমি সারাদিন বসে এঁকে ছিলাম বলে—সেইখানা—

আনন্দে, উত্তেজনায় কাঁপছে শ্যামল, যেন কোন রাজত্ব লাভের সংবাদ দিল সে তপতীকে। শ্যামল বলেই চলল—এই টাকাটা পেলে আমি প্রথমেই ঠিক তোমার জন্যে একটা—

তপতীর হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ থমকে থেমে গেল শ্যামল। তপতীর হাতখানা আল্‌গা হয়ে খসে পড়লো। শ্যামলের চোখের সামনে ভেসে উঠলো ক্ষুধার একটা সর্বগ্রাসী হা। তার বুড়ো মা, পঙ্গু ভাই, বিধবা দিদি সবাই তাকিয়ে আছে শ্যামলের মুখের দিকে। তিন মাসের বাড়ি ভাড়া, মুদির দোকান—নব্বইটি মাত্র টাকা! কি সে উপহার দিতে পারে এর থেকে তপতীকে? মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো শ্যামলের।

আরও কিছুদিন কাটলো। শ্যামল আর পারে না। মাঝে মাঝে টুকটাক কাজের অর্ডার পায় জানাশোনা মহল থেকে, কখনো বা দুই একটা ছবি বিক্রি হয় নামমাত্র দামে। কিন্তু এভাবে তো আর চার চারটে পেট চলে না। ছবি আঁকার সরঞ্জাম কি কম কিনতে হয়? মূলধন নাই, সহায় নাই। উপবাসী চোখে প্রকৃতির রূপ রুক্ষ, স্তিমিত হয়ে আসে। ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় শিল্পী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধ। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে হয় মা, না হয় দিদি ঘ্যানর ঘ্যানর করে—ওরে, এত লোকের চাকরি জোটে আর তুই পাশ করা ছেলে, যা হক একটা চাকরি কি তোর জোটে না? ওর কাছে গিয়েছিলি, তার কাছে লিখিছিলি—কি ছাই রঙ তুলি নিয়ে পড়ে থাকিস, আর কদিন চলবে এমন করে? পঙ্গু ভাই বিনুটা ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শ্যামলের ছবিগুলোর দিকে।

শ্যামল ছুটে যায় তপতীর কাছে। এতটুকু ভরসা, এতটুকু বুকের জোর চায় সে। হোক মিথ্যে, তবু একটু সান্ত্বনা যেন দেয় তপতী। তপতী একবার বলুক তাকে—না না, একদিন লোক তোমার ভিতরের শিল্পীকে চিনবে, তোমার দিকে ভাগ্য লক্ষ্মী মুখ তুলে না তাকিয়ে পারবে না। কিন্তু কই, তপতী তো তা বলে না? তপতী বলে—তুমি আনপ্র্যাকটিক্যাল শ্যামল। আমাদের যে বাঁচতে

হবে সেইটেই আদি অকৃত্রিম সত্য! তপতী নিজেই যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেখানে হোক, যে মাইনেতে হোক শ্যামলকে কোনোমতে একটা বাঁধা মাইনের চাকরির যোগাড় করে দিতে তাও তো জানে শ্যামল!

শ্যামলের মা শয্যা নিলেন। কাসতে কাসতে সারারাত ঘুম হয় না। শ্যামল পায়চারি করে বেড়ায়। চেনা ডাক্তারের কাছ থেকে কদিন ধারে ওষুধ আনে। কিন্তু আর কদিন?

রঙ, তুলি, ছবির কাগজে ধুলো জমে যায়। শ্যামল পাগলের মতো সারাদিন ঘুরে বেড়ায়—কোনোমতে, কোনোখানে যা হ'ক একটা চাকরি তাকে যোগাড় করতেই হবে। মাকে তার বাঁচাতেই হবে। কত দুঃখে, কত কষ্টে শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত দিয়ে মা তার কলেজে পড়ার খরচটুকু যোগাড় করেছেন, মনে করে চোখ ভরে জল আসে শ্যামলের। বাবা মারা যাবার পর বাবার শেষ চিহ্নটুকু ছিল মায়ের হাতে একগাছি সরু সোনা-বাঁধানো লোহা। সেটিও মা বের করে দিয়েছিলেন শ্যামলের পরীক্ষার ফি দিতে। আজ মা মৃত্যুশয্যায়। শ্যামল কি পারবে না তাঁকে বাঁচাতে।

পাগলের মতো ছুটে যায় শামল তপতীর কাছে। বলে: তপতী, ডাক্তার বলে গেল মায়ের টি বি হয়েছে। আর সময় নেই তপতী। তুমি যে চাকরিটার কথা বলেছিলে তোমার দাদার অফিসে—কিংবা আর কোথাও—কান্নায় গলা ধরে আসে শ্যামলের।

তপতী বলে: সে চাকরি তো হয়ে গেছে। তবে আমার বন্ধু লীলার বাবার ব্যবসায় নাকি একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলেছে। সেখানে খোঁজ করতে পারি।

তাই কর তপতী—যা হ'ক কর—যা হ'ক।

চাকরিটা হয়ে গেল শ্যামলের। লীলার বাবা মিঃ দত্ত 'ডাট কোম্পানির' প্রোপ্রাইটার শ্যামলের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছেন। মাস দুই সামান্য হাত খরচে এ্যাপ্রেন্টিস্ থাকার পর পুরো মাইনেতে বহাল হবে শ্যামল। কোনো মতে আর দুটো মাস।

দুটো মাস কাটলো না। মাকে শ্যামল বাঁচাতে পারলো না। বড্ড দেরিতে ধরা পড়েছিল রোগটা। মাস দেড়েকের মধ্যেই মা মারা গেলেন।

নির্মম দুনিয়ার উপর যেন প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল শ্যামল। কত টাকা চাই তার? কত টাকা সে রোজগার করতে পারে তা একবার দেখিয়ে দেবে রাক্ষুসী দুনিয়াকে। ক্রমে ক্রমে ব্যবসার কাজে হাত পাকলো

শ্যামলের। চাকরির উন্নতি হতে লাগলো। একদিন সে হয়ে উঠলো মিঃ দত্তের ডান হাত। সময় নেই শ্যামলের। তপতীর সঙ্গে আর দেখা হয় না বেশি। ওরা কেমন আছে কে জানে? রোজই ভাবে যাবে একবার, কিন্তু হয়ে ওঠে না কাজের চাপে।

হাল ফিরে গেল শ্যামলদের বাড়ির। এবার তপতীর মা, দাদা, উস্‌খুস করছেন। বিয়েটা হয়ে গেলেই তো হয়। তপতীও যেন মহা লজ্জায় পড়েছে। আর যেন তার এ বাড়িতে থাকা উচিত নয়। কিন্তু শ্যামল কি চিরকালই এমনি আনপ্র্যাকটিক্যাল থাকবে? বিয়ের কথাটাও কি তপতীকেই মনে করিয়ে দিতে হবে? অভিমানে মুখ ভার হয়ে আসে তপতীর।

আর না পেরে এক রবিবার দুপুরে পা টিপে টিপে তপতীই গিয়ে ঢোকে শ্যামলের ঘরে। অবাক করে দেবে শ্যামলকে। কিন্তু কই, কোথায় শ্যামল? পাশের ঘরে শ্যামলের দিদি অঘোরে দিবা নিদ্রা যাচ্ছেন। বিনুটার চোখে ঘুম নেই। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে শ্যামলের অনেকদিনের ধুলোপড়া অসমাপ্ত কতগুলো ছবি আর ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে রাখছে। তপতীকে দেখে বিনুর ভারী আনন্দ হলো। অনেকদিন তপতী ওদের দুঃখের কথা শুনেছে, আজ কিছু সুখের কথাও শোনাতে পারবে তাকে। বলল, জানো তপতীদি, আমি হাঁটতে পারব। দাদা বলেছে যে আমাকে এমন বড় ডাক্তার দেখাবে যে, আমার পা সোজা করে দেবে। অনেক টাকা লাগবে কিন্তু সে ডাক্তার দেখাতে। সব টাকা দাদা দেবে।

বিনুর দুইচোখে আনন্দ উপচে পড়ছে। তপতী খুশি হয়ে তার মাথায় আদর বুলিয়ে দিয়ে বলল: তাই নাকি? বাঃ বেশ হবে তা হলে! তা তোমার দাদা কোথায়? আজ রবিবার না?

বিনু বলল, ও, তা বুঝি জানো না তুমি? দাদা তো কদিন ধরেই বাসায় আসছে না। দিদির কাছে টাকা পয়সা সব দিয়ে যায় আর ও এখন আপিসের বড়বাবুর বাড়িতেই ক'দিন ধরে থাকছে। আপিসের কিনা অনেক কাজ পড়েছে তাই। টালিগঞ্জের ওদিকে একটা বাসা ঠিক করেছে দাদা। আমরা শীগ্‌গীরই উঠে যাব সেখানে।

তপতী আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো। মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল তপতীর। তাকে না জানিয়েই শ্যামল এত সব—।

কালই শ্যামলরা এ বাড়ি ছেড়ে টালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে যাবে। তপতীরা খবর পেল ওদের বাড়ির ঠিকে ঝি-এর মুখে। খবর শুনে তপতীর মা আর বৌদি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তপতী কারও দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে সরে গেল সেখান থেকে।

সারাদিন দারুণ অস্বস্তিতে কাটলো তপতীর। শ্যামল কি একবারও আসবে না? এও কি সম্ভব?

তপতী একলা বসে আছে ছাদের ভাঙা কার্ণিশটার গা ঘেঁসে। সন্ধে কখন ঘুরে গেছে। আবছা অন্ধকার ঘিরে ফেলেছে তপতীকে। শ্যামল এলো। হাতে একটা আধখোলা কাগজের মোড়ক। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো তপতীর সামনে।

তপতী মুখ তুলে ধরা গলায় বলল: তুমি এতদিনে এলে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না শ্যামল?

শ্যামল কেমন হতাশ হয়ে তপতীর পাশে বসে পড়ল। হাতের আধ-খোলা মোড়কটা নিচে রাখতেই আলগা হয়ে খুলে গেল। বহুদিন আগে আম্রকুঞ্জে বসে শ্যামল তপতীর যে ছবিখানা এঁকেছিল সেই ছবিখানা, আর শ্যামলের সেই অনেক দেখা জীর্ণ একখানি ধুতি ও একটি কলার ছেঁড়া সার্ট। ছেঁড়া কলারে তপতীর হাতের সেলাই। আশ্চর্য! এগুলো শ্যামল রেখে দিয়েছিল? কেন? তপতী নির্বাক বিস্ময়ে খোলা মোড়কটার দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্যামল কাঁপা গলায় বলল: তপতী, তুমি যে শ্যামলকে ভালবেসেছিলে, এ দুটি জিনিস সেই শিল্পী শ্যামলের শেষ অস্তিত্ব। তোমার কাছেই রেখে যাই। তোমার সে শিল্পী শ্যামল আর নেই জেনো—সে মরে গেছে, মরে গেছে—। শ্যামল যেন কেমন টলছে। কথাগুলো জড়ানো।

তপতী ভয় পেয়ে চমকে উঠল। এ সব তুমি কি বলছ শ্যামল? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি।

দুই হাতে শ্যামলকে শক্ত করে ধরে নাড়া দিল তপতী। বল বল কি হয়েছে তোমার—

শ্যামল জড়িয়ে জড়িয়ে বলল: ভেবেছিলাম তোমাকে একেবারে অ-বা-ক করে দেব। চাকরির কত উন্নতি হয়েছে আমার। টালিগঞ্জের বড় বাড়ি ভাড়া করেছি। ভেবেছিলাম তোমাকে একেবারে গৃহলক্ষ্মী করে নিয়ে যাব আমার ঘরে—আর তুমি অবাক হয়ে যাবে—

তপতী অধৈর্য হয়ে উঠল: কি হয়েছে? তুমি অমন করছ কেন শ্যামল?

এ কি? তাকাও তো আমার দিকে ভাল করে—তুমি কি নেশা করেছ নাকি? উঃ! শ্যামল! তপতী ভেঙে পড়ল।

শ্যামল হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল: হ্যাঁ, নেশা করেছি। নেশা করেই এসেছি তপতী। নেশা না করলে তোমার কাছ থেকে হয়ত যেতে পারব না, তাই—নেশার ঘোর থাকতে থাকতে আমায় যেতে দাও তপতী...আজ সকালে মিঃ দত্ত আমার বাড়ি-ঘরের খোঁজ নিলেন সব—টালিগঞ্জের বাড়ির ছয় মাসের অগ্রিম ভাড়া তিনি দিয়েছেন—ম্যানেজারের পোস্ট দিয়েছেন—কেন? কেন তা জান?

তপতী: কি? কি বলছ তুমি—

শ্যামল: হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, এখনো আছে নেশার ঘোর। প্রোপ্রাইটার দত্তের একমাত্র কন্যা নীলাদেবী পছন্দ করেছেন আমাকে—দত্তর ছেলে নেই। এমন প্রতিভাবান ছেলেকে তিনি নিজের ছেলের আসনটি দেবেন ঠিক করেছেন। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা—আর তা না হলে এই এই ছেঁড়া ধুতি আর সার্ট—হা—হা—হা—হা...বাসায় এসেই চাকরিতে ইস্তফা দেবার জন্য চিঠি লিখতে বসলাম। পঙ্গু বিনুটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এলো: দাদা, কবে আমি হাঁটতে পারব? তুমি না বলেছিলে...মাকে আমি বাঁচাতে পারিনি তপতী, বিনুকে আমি কি বলব?...পারলাম না, পারলাম না। তপতী, চাকরিটি ছেড়ে দিতে পারি নি তক্ষুণি—টাকা, টাকা! টাকার বড় দরকার আমার...তাই নেশা করে এসেছি। তুমি না বলেছিলে আমি আনপ্র্যাকটিক্যাল? শিল্পী শ্যামল বড় আনপ্র্যাকটিক্যাল ছিল, এখন ব্যবসাদার শ্যামল কত বেশি প্র্যাকটিক্যাল হয়েছে দেখ তপতী...এই নেশার ঘোরটা যদি কেটে যায় আবার হয়তো আনপ্র্যাকটিক্যাল হয়ে পড়ব—তখন হয়তো আবার এসে এই ছেঁড়া জামাটা আর কাপড়টার খোঁজ করব তোমারই কাছে...হা হা...ভয় হচ্ছে! ভয় হচ্ছে! নেশাটা কেটে না যায়...ওকি! তুমি অমন করে চেয়ে আছ কেন? তপতী—তপতী! ওকি! তুমি কি আমাকে ঘৃণা করছ? আমি কি দুর্বল? না, না, তুমি আমায় দয়া করে ত্যাগ কোরো তপতী, কিন্তু ঘৃণা! তোমার কাছ থেকে ঘৃণা! চোখ নামাও তপতী, চোখ ফেরাও—আমি সইতে পারছি না।

শ্যামল উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। নিশ্চল বিমূঢ় তপতীর চোখের সামনে থেকে সন্ধ্যা তারাটা কোথায় যেন ডুবে গেল।